পূজাবার্ষিকী ১৪৩৩

নিভৃত্তি নবপত্রিকা

2026

Digital Exclusive

ফিরে দেখা

উৎসবের মুহূর্ত

বর্ণময় ক্যানভাস

Chairman’s Message

Dear Friends,
It gives me immense joy to welcome you once again through the pages of *Nivritti - Nabapatrika*, our annual publication accompanying the celebration of **Durga Puja 2026**. What began as an idea to capture the spirit of our community has, within a short time, become a cherished platform for sharing our
stories, creativity, memories, and cultural heritage.
This year holds a special place in our journey as **Indian Cultural Connection Essen e.V. celebrates its 3rd Durga Puja in Essen**. Looking back at how far we have come, I feel a deep sense of gratitude. Each year, more hands have joined in preparation, more families have participated, and more friendships have been formed. What we create together is much more than an annual festival - it is a community that continues to grow around shared traditions and a sense of belonging.

Durga Puja reminds us that traditions remain alive when they are **practised, shared, and passed on**. For many of us living far from the places where we grew up, these few days bring familiar sights, sounds, rituals, food, music, and emotions back into our lives. At the same time, it gives our children an opportunity to experience and understand the traditions that are part of their heritage, while sharing them with friends and the wider community here in Germany.

Our celebration would not be possible without the extraordinary commitment of our **members, volunteers, participants, artists, well-wishers, donors, sponsors, and friends**. Every contribution matters - whether it is arranging the Puja, preparing food, decorating the venue, performing on stage, helping behind the scenes, supporting us financially, or simply joining the celebration with enthusiasm. To each of you, I offer my sincere gratitude.

Through *Nivritti - Nabapatrika*, we hope to preserve some of these moments beyond the five days of celebration. Every article, photograph, artwork, memory, and contribution becomes a small part of the story we are building together - a story that future generations of our community can look back upon with pride.

As ICC Essen continues its journey, I hope we remain a community that is **open, inclusive, respectful, and connected** - proud of our Indian roots while building meaningful bridges with the society we call home. Culture has a wonderful ability to bring people together, and I believe this will always remain at the heart of Indian Cultural Connection Essen e.V.

On behalf of **Indian Cultural Connection Essen e.V.**, I warmly welcome you and your families to our **3rd Durga Puja and Autumn Festival 2026.** May Maa Durga bless us all with strength, wisdom, happiness, and harmony, and may the bonds of our community grow stronger with every passing year.

Subho Durga Puja 2026 to all!

With warm regards,
Abhishek Ghosh
Chairman
Indian Cultural Connection Essen e.V.

Durga pujo doodle

- Sohini Maiti

Penned by Ashis Chatterjee

- Kolkata

অভিমানী শরৎ

শারদ আকাশে মুগ্ধ বাতাসে
মা তুই নেই আমার পাশে
আমার আনন্দ হবে না ভাগাভাগি
কার সাথে করবো রাগারাগি
সুদূর এসেনে করছিস মজা
ইচ্ছে করছে যাই চলে সোজা
তোর কাছে দদোনের কাছে
মাগো জানাও কোনো উপায় আছে?

Pillars of the Soul

The richest wealth is Wisdom
The strongest weapon is Patience
The best security is Faith
The greatest tonic is Laughter
and surprisingly all are Free

Anwita Patra

Durga Puja Zeitung

-Abhyuday Das, 10 years

A day with a crocodile

-Saanvi Ghosh , 10 years

On a sunny morning, I went for a walk near the river. Suddenly, I saw a V-shaped snout pointing right at me. After a few seconds, I realised it was a crocodile. I jumped and fell onto

the ground.

The crocodile came closer to me and said, "Don't be afraid. I won't harm you."

I was so surprised to see a crocodile talking to me.
"You are a crocodile! How can you talk?" I asked.
"Yes, I can talk," the crocodile smiled.
"What do you want from me?" I asked.

"I don't want anything from you. I just want to be your friend," he said.

"How can you talk, and who are you?" I asked.

"I was a human swimming in this river when suddenly I touched a yellow tang fish. I didn't

know it was magical. My name is Connor," said the crocodile.
"Are you happy to be a crocodile?" I asked.

"Actually, no. But I know where the yellow tang lives. First, I need to give you some scuba-diving equipment," said Connor.

After a while, we went to Connor's house and got the equipment we needed. We scuba-dived to the yellow tang's house and knocked on the door.

The yellow tang opened the door.
"Greetings, Connor!"

"Why did you do this to me?" asked Connor.

"Because I didn't know that I was magical from the day I was born!" said the yellow tang.

"So, I... uh... um... am really sorry!"

After some time, I said, "Connor, it's getting late. My parents are worrying about me."

"Bye, Connor!" said the yellow tang.
"Bye!" said Connor.

Connor and I swam back to the surface. We sat down beside the river.

“I never got your name,” said Connor.

“I’m Scarlett, but I have to go now!” I replied.
“Will you come back tomorrow?” Connor asked.

“Yes!!!” I replied.

Rihaan Ganguly, 9 years

Shatarupa Ganguly

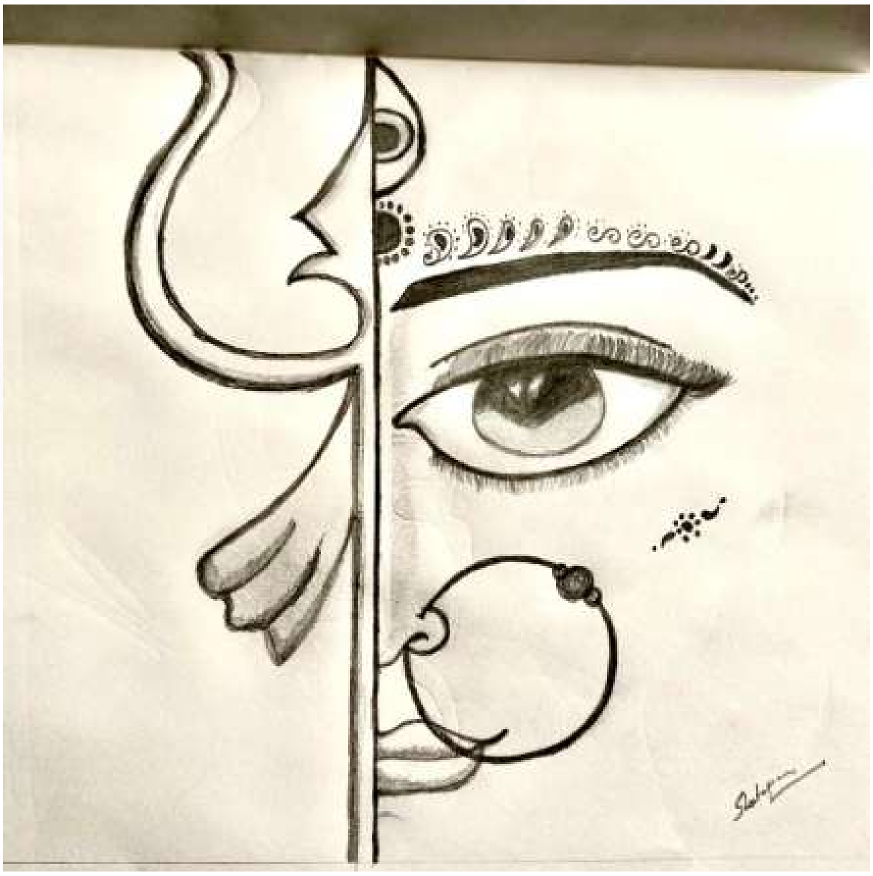

The Road to My Old Nest

-Priyanka Ghosh Das

Beneath many skies, I learned to roam,
an uncaged bird, yet dreaming home.
The world grew wide, my wings grew strong,
yet still the old hearth calls me home.
I have wandered where the wild winds lead,
through distant lands and skies unknown;
yet memory keeps its quiet creed—
that roots remember what wings outgrow.
The world turns strange, its seasons wane;
melancholy softens joy and pain.
Still, hope walks gently by my side,
through every shore, through every tide.
For home is not where weary wings alight,
nor where the world bids us belong;
it is the hush within the heart that knows our name,
and keeps it long.
And though I wander, free and far,
beneath a thousand skies and stars,
my heart still knows, as hearts will do—
the little nest where I once grew in.

"কাশফুলের দুই পারে"

- কলমে রামধনু

(১)

শরতের আকাশের একটা আলাদা গন্ধ আছে, এই গন্ধকে কোনো বোতলে ভরে রাখা যায় না, কোনো শহরের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না, অথচ বহু বছর পরেও হঠাৎ কোনো এক বিকেলে, জানালার বাইরে সাদা মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ দেখলেই বুকের ভেতর কোথা থেকে যেন সেই গন্ধটা ফিরে আসে,

তখন মনে হয় - কাশফুল ফুটেছে!
নদীর ধারে।
দূরের মাঠের ওপারে।
আর গ্রামের রাস্তা ধরে
ছুটছে একদল বাচ্চা।

অনিকেত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন-এর সেপ্টেম্বরের সকাল, আকাশে মেঘ, বাতাসে হালকা ঠান্ডা। গাছের পাতাগুলোও যেন ধীরে ধীরে বুঝে ফেলেছে- গ্রীষ্ম শেষ।

ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে তিতিরের গলা ভেসে এল-
"বাবা আমার সবুজ ওড়নাটা কোথায়?"
"সোফার ওপর দেখ।"
"না নেই।
"ও মা একটু খুঁজে দাও না।
"তাহলে কাল যে ব্যাগটা নিয়ে পার্কে গিয়েছিলি, সেটার মধ্যে দেখ।
"ওহ! পেয়ে গেছি।"
তারপর আবার ছোটাছুটি।
আজ পার্কে রিহার্সাল। আজকের তাড়াহুড়ো তারই পরিনাম।
পুজো আসছে। এখন-এর বাঙালীদের পুজো।

বাচ্চারা নাটক করবে, গান করবে, নাচ করবে। কেউ কবিতা বলবে। কেউ নাচের অনুশীলন করবে, কারও গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত।
অনিকেত হাসল।
তার মেয়ের মুখে আজকাল বাংলা উচ্চারণ একটু বিদেশি টান পেয়েছে, "শারদীয়া" বলতে গিয়ে "শরদিয়া" হয়ে যায়।
"কাশফুল" বলতে গিয়ে কখনও "কশফুল" কখনও "কুশফুল"।
কিন্তু ও যখন বলে- "বাবা, আমাদের পুজোতে কাশফুল থাকবে তো?"
তখন অনিকেতের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে।
কারন সে জানে-
কাশফুল শুধু একটা ফুল নয়।
কাশফুল মানে একটা গ্রাম।
একটা নদী।
একটা কাঁচা রাস্তা।
একটা বিকেল।
আর অনেকগুলো হারিয়ে যাওয়া মুখ!
অনিকেতের গ্রামের নাম ছিল চন্দপুর। ছোট্ট গ্রাম।
গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কংসাবতী নদী।
বর্ষায় কংসাবতী ফুলে উঠত, আর শরৎকালে জল একটু কমলে নদীর দুপাশের বালুচরে কাশফুলের রাজত্ব শুরু হত।
সাদা সাদা কাশফুল বাতাসে দুলত। দূর থেকে মনে

হত কংসাবতীর পাশে যেন সাদা মেঘ নেমে এসেছে! সেই সময় পুজো মানেই ছিল নতুন জামা। নতুন জুতো। ঠাকুমাদের আর মায়ের হাতে বানানো নাড়ু। দাদু, বাবা, কাকাদের থেকে দুটো করে টাকা। আর বিকেল হলেই বন্ধুরা মিলে নদীর ধারে ছুট।
"এই দাঁড়া! আমার জন্য অপেক্ষা কর!" চিৎকার করত মিঠু।
"তুই আবার জুতো পরতে এত সময় নিস কেন?" বলত অনিকেত।

"নতুন জুতো তো! কাদা লাগলে মা মেরে ফেলবে।"
সবাই হেসে উঠত।
তারপর ছুট।
কেউ জুতো হাতে।
কেউ খালি পায়ে।
কেউ কাশফুলের ঝোপে ঢুকে হারিয়ে যাচ্ছে।
কেউ আবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়ছে জলে।
সন্ধে নামার আগে বাড়ি ফিরতে হবে।
কারন সেদিন রাতে পাশের গ্রামের পুজো দেখতে যাওয়া হবে।
ওদের গ্রামে বড় পুজো হতো না।
ছোট্ট মণ্ডপ।
খড়ের চাল।
বাঁশের কাঠামো।
কাপড়ের সামিয়ানা।
কিন্তু পাশের গ্রাম কলমিজোড়-এর পুজো ছিল বিখ্যাত।
সেখানে ঠাকুরের মুখে অন্যরকম মায়া ছিল।
অন্তত অনিকেতের তাই মনে হত।
প্রতি বছর সপ্তমীর রাতে সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে-
কলমিজোড়ে যেত।
কখনও ভ্যানে।
কখনও কারও সাইকেলের পেছনে বসে।
আর বেশির ভাগ সময়ই হেঁটে।
রাস্তার একদিকে অন্ধকার মাঠ অন্যদিকে কংসাবতী।
মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।
দূরে কোথাও ঢাক বাজছে।
আর আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য তারা।
সেই তারাগুলোও যেন তখন একটু বেশি কাছে ছিল।

পুজোর মণ্ডপে পৌঁছনোর পর তাদের চোখ বড় হয়ে যেত।
আলো।
ধুপের গন্ধ।
ঢাকের শব্দ।
চপ, পাঁপড় আর ফুচকার দোকান।
ঝালমুড়ি।
কাঠির মাথায় রঙিন বেলুন।
আর ঠাকুর।
অনিকেত আজও মনে করতে পারে সেই মুহূর্ত।
দেবীর চোখের দিকে তাকালে ওর মনে হত – মা যেন সত্যিই তাকিয়ে আছেন।
তারপর বিসর্জনের দিন এলে বুকটা ভার হয়ে যেত।
মনে হতো, এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল কেন?

(২)

বহু বছর পর অনিকেত বুঝেছিল–
পুজো আসলে কখনও শেষ হয় না।
আমরাই বড় হয়ে যাই।
গ্রামটা বদলে যায়।
নদীর গতিপথ বদলে যায়।
মানুষগুলো একে একে চলে যায়।
কিন্তু শরতের আকাশে একদিন যদি হঠাৎ কাশফুল দুলে ওঠে, তাহলে সেই পুরানো পুজো আবার ফিরে আসে।
"বাবা" — মেয়ের ডাক শুনে অনিকেত চমকে উঠলো।
"হ্যাঁ ?" —"চলো! দেরি হয়ে যাচ্ছে। সবাই পার্কে চলে গেছে।"
"আচ্ছা, চল।"
আকাশী নীল জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে সে দরজা বন্ধ করল।

এই বিদেশ বিভুঁই এসেন-এর পার্কে আজ অনেক বাঙালি পরিবার এসেছে। কেউ চা নিয়ে এসেছে। কেউ বাচ্চাদের পোশাক ঠিক করছে। কেউ মোবাইলে গান চালিয়ে নাচের স্টেপ দেখাচ্ছে। গাছের নীচে এক কোনে পাঁচ-ছয়জন বাচ্চা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। "এক, দুই, তিন, চার"... নাচের শিক্ষিকা হাত তুলে তাল দিচ্ছেন।

অনিকেত একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল।
তার মেয়েটা মাঝখানে।
চোখে উত্তেজনা।
মুখে হাসি।
হঠাৎ পাশের এক মা বললেন,
"দেখেছেন? বাচ্চাগুলো কত আনন্দ করছে!"
অনিকেত মাথা নাড়ল।
"হ্যাঁ।"
তারপর কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বলল,
"আমাদের সময়েও করতাম,"
"কোথায়?"
"গ্রামে।"
মহিলাটি হেসে বললেন,
"আপনার গ্রাম?"
অনিকেত পার্কের ওপারে তাকাল।
গাছের ফাঁক দিয়ে শরতের আলো পড়েছে।
তার চোখের সামনে হঠাৎ এসেন-এর পার্কটা বদলে গেল।
সে দেখতে পেল
নদী।
কাশফুল।

কাঁচা রাস্তা।
আর ছোট্ট অনিকেত দৌড়ে যাচ্ছে।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যায় মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অনিকেত হঠাৎ রাস্তার পাশে কিছু সাদা ফুল দেখতে পেল। কাশফুল নয়। অন্য কোনো ফুল। তবু দেখতে ঠিক কাশফুলের মতো।

মেয়ে বাবার হাত ধরে বলল,
"বাবা ওগুলো কি কাশফুল?"
অনিকেত একটু থামল।
"না"
"কাশফুল কোথায় পাওয়া যায়?"
"আমাদের দেশে।"
"ভারতে?
"হ্যাঁ, বাংলার অনেক গ্রামে।"
"তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?"
অনিকেত মেয়ের দিকে তাকাল।
"কোথায়?"
"তোমার সেই গ্রামে।"
অনিকেত কিছু বললো না।
অনেক বছর ধরে সে গ্রামে যায়নি।
কারন যাওয়া হয়ে ওঠেনি।
যে বাড়ির উঠোনে মা, ঠাকুমারা বসে নাড়ু বানাতেন, সেই উঠোন আর নেই, সেই কাঁচা মাটির বাড়িও আজ আর নেই।

যে নদীর ধারে সে বন্ধুদের সঙ্গে ছুটত, সেই কংসাবতী আজ গতিপথ বদলেছে।
মিতু কোথায় আছে সে জানে না।
স্বপন কোথায় আছে সে জানে না।
তবু মেয়ের প্রশ্নটা তার ভেতরে কোথাও একটা দরজা খুলে দিল।
"নিয়ে যাব," সে আস্তে করে বলল।
"সত্যি?"
—"হ্যাঁ সত্যি।"
মেয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
"তাহলে আমি কাশফুল তুলব!"
অনিকেত হেসে বলল,
"না। কাশফুল তুলতে নেই।"
"কেন?"
"ওদেরকে বাতাসে দুলতে দিতে হয়।"
-সেই রাতে অনিকেত অনেকক্ষন ঘুমোতে পারলো না।
জানলার বাইরে এসেন-এর আলো।
দূরে গাড়ির শব্দ।
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।
কিন্তু তার চোখের সামনে কেবল একটা দৃশ্য—
শরতের বিকেল।
নদীর ধারে কাশফুল।
আর ছোট্ট একটা ছেলে হাতভর্তি কাশফুল নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

মা দরজায় দাঁড়িয়ে বলছেন,
"এত দেরি করলি কেন?"
ছেলেটা হাসছে।
"মা কাশফুল দেখতে গেছিলাম।"
"কাশফুল দেখতে আবার এত দূর যেতে হয়?"
ছেলেটা উত্তর দিলো,
"হ্যাঁ, হয়।"
কারন তখন সে জানত না—
কোনো কোনো জায়গায় ফিরে যেতে হলে একদিন
পৃথিবীর অর্ধেকটা পথ পেরোতে হয়।

(৪)

পরের সপ্তাহে পার্কে আবার রিহার্সাল।
বাচ্চারা এবার গান শিখছে।
"এসো হে শরতে....."
গানটা শুরু হতেই অনিকেত চোখ বন্ধ করল।
তার মনে হল, এসেন-এর পার্কে সে আর বসে নেই।
সে আবার সেই কংসাবতীর ধারে।
কাশফুল দুলছে।
দূরে ঢাক বাজছে।
কেউ একজন চিৎকার করে বলছে—
"চল ঠাকুর দেখতে যাব!"
আর ছোট্ট অনিকেত দৌড়ে যাচ্ছে।
তার পিছনে তার শৈশব।
আর সামনে শরৎ।

আর দুপাশে –
অসংখ্য সাদা কাশফুল।
একটা সময় যে কাশফুল তাকে গ্রামের পথ দেখিয়েছিল,
আজ সেই কাশফুলই যেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে –
তার নিজের কাছে।

এসেন-এর শরৎ আর বাংলার শরৎ এক নয়।
এখানে রুর বা রাইন নদীর ধারে সেই বিশাল কাশবন নেই।
এখানে পুজোর ঢাকের শব্দের সঙ্গে ট্রামের শব্দ মিশে যায়,
এখানে বাচ্চারা বাংলা গান শেখে ইউটিউব দেখে।
এখানে রিহার্সাল হয় খাকে,
পুজোর মণ্ডপ বানাতে হয় অন্য শহর বা ভারত থেকে
জিনিস এনে।

তবু আশ্চর্য ভাবে –
মায়ের মুখের হাসি একই থাকে।
বাবার চোখের জল একই থাকে।
বাচ্চাদের আনন্দ একই থাকে।
আর শরতের আকাশ ?
সে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক,
তার নীল রং বদলায় না।
শুধু বদলে যায়
মানুষের ঠিকানা।

(৫)

বছর কয়েক পর অনিকেত সত্যিই মেয়েকে নিয়ে গ্রামে গেল।
মায়ের লাগানো গন্ধরাজ ফুলের গাছটাও নেই।
কংসাবতীর দুইধারা ছোট হয়ে গেছে। বয়সের ছাপ
পড়েছে যেন।
পুরনো বাঁশের সাঁকোটা নেই। নতুন কংক্রিটের ব্রিজ
হয়েছে পারাপারের জন্য।
মিতুদের বাড়ির জায়গায় নতুন পাকা দালান।
অনিকেত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
মেয়ে তার হাত ধরে বলল,
"বাবা!..
"হুম ?"
"কাশফুল কোথায় ?"
অনিকেত নদীর পারের দিকে তাকাল।
সেখানে এখনও কিছু কাশফুল ফুটেছে।
অনেক কম। তবু আছে। তিতির দৌড়ে গেল।
অনিকেত ধীরে ধীরে তার পেছনে হাঁটতে থাকল।
বাতাসে কাশফুল দুলছে। একটা কাশফুল মেয়ের চুলে
এসে আটকে গেল। তিতির ফিরে তাকিয়ে হাসল।
"বাবা দেখো"!
অনিকেতের চোখ ভিজে গেল।
সে বুঝল — শৈশব আসলে হারিয়ে যায় না।
আমরা শুধু তার কাছে যাওয়ার রাস্তা ভুলে যাই।
কোনো এক শরতের বিকেলে,
কোনো এক পার্কে,
কোনো এক শিশুর মুখে,

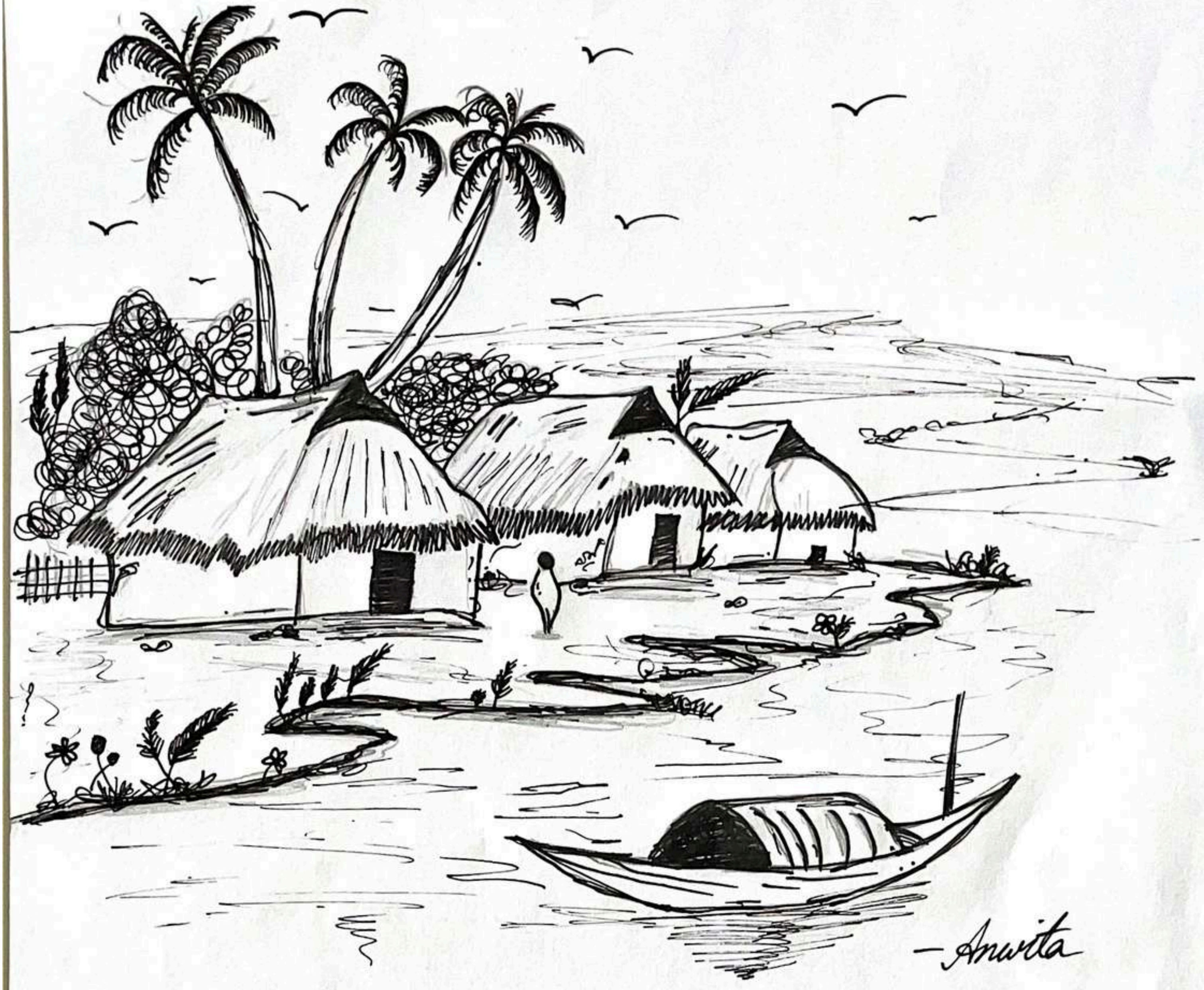

কোনো এক অচেনা সাদা ফুলের দোলায়-
সে আবার ফিরে আসে।
আর তখন মনে হয়-
নদীটা এখনও বয়ে চলেছে। দূরের গ্রামে এখনও ঠাকুর
দেখা যায়। ঢাক এখনো বাজে। বাচ্চারা এখনও দৌড়ায়।
আর কাশফুল-
কাশফুল এখনও বাতাসে দোলে!
দুই বাংলার দুই প্রান্তে।
দুই সময়ের দুই পারে।
একই আকাশের নিচে।
একই স্মৃতির ভিতরে।

—কলমে ✍ রামবিন //

সমাপ্ত

পুজোর নেমন্তন্ন

- প্রান্ত বিশ্বাস, মুনস্টার

পুজো এলো পুজো এলো,
বেজায় খুশি মন
কি করবো, কি পরবো
ভাবছি সারাক্ষণ।
ষষ্ঠীতে 'এসেন' যাবো,
সপ্তমীতে 'কোলন'
অষ্টমীতে 'ডুসেলডর্ফে'
করবো যে ভ্রমণ
নবমীরটা ভাবা হয়নি
দশমীর টা জানি,
ওদিন নাকি নাটক হবে
এলিয়েনরা এসেন আসবে
বউ বলেছে, মিস হবেনা
একটা প্রোগ্রাম ও বাদ যাবেনা
তাইতো বলছি ভাই,
চলে আসুন সবাই,
এবারের পূজোতে
প্রবাস জীবনটাকে
একটু নতুন করে নেচে গেয়ে কাটাই...

মনের নিভৃত জানালায়

- Ratna Ghosh, New Delhi

মেঘলা দিনে আকাশ আঁধার,
মন উতলা,
ঝমঝম বৃষ্টির আগাম জানানী,
ময়ূরের পেখম মেলা।

কোন সুদূরের পদশব্দের
প্রত্যাশী হয়ে বসে জানালায়?
দুহাত বাড়িয়ে বৃষ্টিকে ছুঁই,
তার ওড়নায় মন ডানা মেলে,
মুঠোয় ধরে আনি মেঘটাকে।

মন কি ব্যাকুল প্রত্যাশায়!

চলো না, উড়ে যাই একসাথে দুজনেই,
মেঘকে ছুঁয়ে আবার
বৃষ্টি হয়ে নেমে আসি,
আমার মনের কোণের
নিভৃত জানালায়!!!

From India to Essen: *A Little Piece of Home*

- Abhishek Ghosh

Sometimes, we don't realise how much a place means to us until we leave it behind. As children in India, festivals simply happened around us. We never had to create them. The streets changed, the house became busy, new clothes appeared, familiar music filled the air, and friends and relatives were suddenly everywhere.

We never thought that one day we would miss these ordinary moments so much. Life brought us thousands of kilometres away. We came to Germany, built careers, made friends and raised families. Slowly, an unfamiliar city became familiar.
Essen became home.

And yet, when Durga Puja approaches, somewhere inside us, we become children again.
We remember the people, the sounds, the excitement—and sometimes the people who are no longer there to celebrate with us.
Perhaps that is why we try so hard to create a little piece of that feeling here.
An empty hall slowly fills with decorations, music, food and familiar faces.
Children run around while parents are busy.
Someone is looking for something that has gone missing.
Someone is laughing.
Someone is stressed. Nothing is perfect.
But then you look around the room and, just for a moment, India doesn't feel so far away.
And then you see your children.
For many of them, Germany is home. The Durga Puja we remember from our childhood exists only in the stories we tell them.
We cannot give them our childhood.
But we can give them their own memories.
Maybe they will remember dressing up for Puja. Maybe they will remember performing on stage, sharing food or running around with their friends while we kept telling them to behave.
And perhaps, many years from now, when we are older and they have families of their own, one of them will say:

"I remember Durga Puja in Essen. We used to celebrate it together every year."
Maybe they will not remember who organised it.
Maybe they will not remember whether everything went according to plan.
But hopefully, they will remember how it felt.
To belong.
To be surrounded by people who cared.
To know that Germany was their home, while India was also a part of who they were.
That, perhaps, is why we do all of this.
We came to Germany carrying memories of the home we left behind.
Now, together, we are creating the memories our children will one day carry with them.

Indian Cultural Connection | ICC Essen e.V.

দুধ মাছ

- Paromita Paul

কিছু রান্না শেখা হয় রেসিপির বই থেকে, আর কিছু রান্না শেখা হয় ভালোবাসা দিয়ে।
এই দুধ মাছটা তেমনই—আমার দিদার কাছ থেকে শেখা প্রথম দিকের রান্নাগুলোর একটি।
দিদার রান্নার সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার ছিল, খুব সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই কীভাবে অসাধারণ স্বাদ তৈরি করা যায়। এই রান্নাটিও তারই প্রমাণ। না আছে অনেক মশলার ঝামেলা, না আছে দীর্ঘ সময় রান্নাঘরে কাটানোর প্রয়োজন। রুই মাছ, দুধ, সর্ষের তেল আর সামান্য কিছু মশলা—এই দিয়েই তৈরি হয়ে যায় একেবারে ঘরোয়া, মায়ামাখা একটা রান্না। আজকের এই ব্যস্ত জীবনে, যখন রান্নার জন্য বেশি সময় বের করা সবসময় সম্ভব হয় না, তখন দিদার এই রেসিপিটা আমার কাছে ভীষণ special। অল্প উপকরণ, অল্প সময় আর একেবারে সহজ পদ্ধতি—তবুও স্বাদে কোনও কমতি নেই।
আর গরম ভাতের সঙ্গে এই দুধ মাছ?
সেটা তো একেবারে দিদার বাড়ির দুপুরের মতো।

<u>উপকরণ</u>

- রুইমাছ – ১ কেজি
- সর্ষেরতেল – ১০০ ml
- দুধ – ৫০০ ml
- পাঁচফোড়ন – ১ টেবিল চামচ
- কাঁচালঙ্কা – ৬টি
- হলুদ – পরিমাণমতো
- নুন – স্বাদমতো
- চিনি – স্বাদমতো

<u>প্রণালী</u>

১. মাছ মাখিয়ে রাখা
রুই মাছের টুকরোগুলোতে নুন ও হলুদ ভালো করে মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে।

২. মাছ হালকা করে ভেজে নেওয়া
কড়াইতে ১০০ ml সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তেল গরম হলে মাখানো মাছগুলো দিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। মাছ বেশি লাল বা কড়কড়ে করার দরকার নেই।

৩. দুধের ঝোল তৈরি
এবার ওই একই তেলে পাঁচফোড়ন ও ২টি কাঁচালঙ্কা দিয়ে ফোড়ন দিতে হবে। ফোড়ন ফুটে উঠলে সাবধানে ৫০০ ml দুধ ঢেলে দিতে হবে। সঙ্গে এক চিমটি হলুদ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪. মাছ দিয়ে দেওয়া
দুধ ফুটে উঠলে স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে দিতে হবে। এবার হালকা ভেজে রাখা মাছগুলো একে একে দুধের ঝোলে দিয়ে দিতে হবে।

৫. ঝোল একটু ঘন করা
মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে যতক্ষণ না ঝোলটা একটু কমে হালকা ঘন ও মসৃণ gravy-এর মতো হয়ে আসে।

৬. দমে রাখা
Gravy ঘন হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে কড়াইয়ের ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। এতে মাছের মধ্যে দুধের মোলায়েম স্বাদটা ভালোভাবে মিশে যাবে।

দিদার টিপস
এই রান্নার আসল সৌন্দর্য হল এর সরলতা। বেশি মশলা বা বেশি কিছু যোগ করার প্রয়োজন নেই। সর্ষের তেলের গন্ধ, পাঁচফোড়নের ফোড়ন, দুধের মোলায়েম স্বাদ আর কাঁচালঙ্কার হালকা ঝাঁঝ—এইটুকুই যথেষ্ট।
গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
দিদার রান্না হয়তো খুব সহজ ছিল, কিন্তু সেই সহজ রান্নার স্বাদেই লুকিয়ে থাকত একরাশ ভালোবাসা।

Abhyuday Das, 10 years - My idea of an adventure in a small comic presentation.

Inspired from The Diary of a wimpy kid /Gregs Tages Buch. Created through Adobe Scan.

Arnesh Dey, 11 years

Aarushi Dey

এই ক'টা দিনের জন্যই তো অপেক্ষা

কিছু rehearsal, কিছু হাসি, আর আমাদের পুজো

— বৈশাখী দে ঘোষ

সারা বছর জীবনটা বেশ নিয়ম মেনেই চলে।
কাজ, সংসার, স্কুল, বাজার, appointment—তারপর কখন যে একটা সপ্তাহ শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হয়, বুঝতেই পারি না।
কিন্তু পুজো আসছে বুঝতে calendar দেখার দরকার হয় না।
একদিন হঠাৎ WhatsApp-এ message আসবে—
“Natok-এর rehearsal কবে থেকে শুরু করব?”
ব্যস।
বুঝে যাবেন—মা আসছেন।
তারপর থেকে আমাদের শান্ত weekend-গুলোর চরিত্র আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করে।
বড়দের নাটক আছে।
বাচ্চাদের আলাদা নাটক আছে।
কেউ গান গাইবেন। কেউ নাচবেন। কেউ musical instrument বাজাবেন। বাচ্চাদের কবিতা আর গান তৈরি করাতে হবে। Adult group song আছে। Opening ceremony-র গান আছে।
আর তারপর কেউ একজন খুব সুন্দর একটা idea দিলেন—
“Couple dance করলে কেমন হয়? 90’s songs!”
Idea-টা শুনতে দারুণ।
তারপর rehearsal শুরু হয়।
“এই step-এর পর আমি কোনদিকে যাব?”
“আমার দিকে!”
“তুমি তো অন্যদিকে যাচ্ছ!”
“আমি অন্যদিকে যাচ্ছি, কারণ তুমি ভুলদিকে যাচ্ছ!”
বাড়িতে যে couple এত বছর দিব্যি পাশাপাশি জীবন কাটিয়ে দিল, একটা 90’s Bollywood song এসে হঠাৎ প্রমাণ করে দিল—
দুজনের left আর right সম্পর্কে মৌলিক মতপার্থক্য আছে।
শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাচ ঠিকই হয়ে যায়।
আর stage-এ দুজনকে দেখে কেউ বুঝতেও পারে না rehearsal-এ কতবার বলা হয়েছিল—
“একবার last time করি।”
আমরা সবাই জানি, last time কখনও last time নয়।
তারপর আছে বাচ্চাদের preparation।
“কবিতাটা একবার বলো।”
“এখন না।”
“গানটা practise করেছ?”
“হ্যাঁ।”
“একবার শুনি?”
“কাল করব।”
“Instrument-টা practise করতে হবে তো!”
“I know, Mama!”
কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন সেই একই বাচ্চা যখন stage-এ উঠে সুন্দর করে কবিতা বলে, গান গায় বা instrument বাজায়, তখন আমরা সামনে বসে এমনভাবে হাততালি দিই যেন rehearsal-এর সময় কোনওদিন tension-ই হয়নি।

আর মনে মনে ভাবি—
“বাহ! এত সহজ ছিল নাকি?”
বাচ্চাটি যদি সেই মুহূর্তে মায়ের মনের কথা শুনতে পেত, সম্ভবত stage থেকেই বলত—
“I told you, Mama!”
বড়দের অবস্থাও অবশ্য খুব আলাদা নয়।
Natok-এর rehearsal-এ dialogue একদম ঠিক।
Stage-এ উঠে হঠাৎ মনে হয়—
পরের line-টা কী ছিল?
সেই এক-দুই second-এ actor-এর চোখে যে গভীরতা আসে, দর্শক ভাবেন অসাধারণ অভিনয় চলছে।
শুধু অন্য actors-রা জানেন—
মানুষটি অভিনয় করছেন না। সত্যিই মনে করার চেষ্টা করছেন।
তারপর পাশ থেকে কেউ খুব বুদ্ধি করে এমন একটা dialogue বলে দেন যাতে গল্প আবার track-এ ফিরে আসে।
দর্শক হাততালি দেন।
আমরা backstage-এ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।
এটাই teamwork।
এর মধ্যে আবার group song-এর rehearsal।
একজন বলছেন, “আরেকবার beginning থেকে করি।”
কেউ lyrics খুঁজছেন।
কেউ নিজের scale খুঁজছেন।
আর কেউ এতক্ষণ খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গান গাওয়ার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করছেন—
“আমরা কোন line-এ আছি?”
তবুও আশ্চর্যভাবে, অনুষ্ঠানের দিন সবাই একসঙ্গে stage-এ দাঁড়ালে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়।
হয়তো একেবারে perfect হয় না।
কিন্তু সেই imperfect-টাই আমাদের।
তারপর অবশ্য আমার ব্যক্তিগত পুজোর preparation-ও আছে।
আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়—
“আমার পরার মতো কিছুই নেই।”
পাশ থেকে স্বামী যদি ভুল করে বলেন,
“এত শাড়ি তাহলে কার?”
বহু বছরের বিবাহিত জীবনের পরেও মানুষ যে এমন ঝুঁকিপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে, দেখে অবাক হই।
আমি শুধু বলি—
“শাড়ি থাকা আর এই পুজোয় পরার মতো শাড়ি থাকা এক জিনিস নয়।”
তারপর আর কোনও প্রশ্ন আসে না।
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই শিখি।
আর দেখতে দেখতে যে rehearsal-গুলো নিয়ে এত দৌড়ঝাঁপ, এত message, এত “আজ পারব না”, “কাল করি”, “আর একবার করি”—সব শেষ হয়ে যায়।
Natok শেষ।
গান শেষ।
নাচ শেষ।
বাচ্চাদের performance শেষ।
Opening ceremony-ও শেষ।
Stage-এর আলো নিভে যায়।
বাড়ি ফিরে পা দুটো বলে, “এবার একটু আমাদের কথাও ভাবো।”
কিন্তু মনটা তখনও কোথাও যেন সেই hall-এই পড়ে থাকে।

কারণ শেষ পর্যন্ত perfect step, perfect dialogue বা perfect note-এর কথা খুব বেশি মনে থাকে না।
মনে থাকে rehearsal-এর হাসিগুলো।
ভুল dialogue-এর পর একে অপরের মুখের দিকে তাকানো।
বাচ্চাদের "এখন practise করব না।"
Couple dance-এর সেই left-right যুদ্ধ।
আর stage থেকে নেমে সবার সেই একই প্রশ্ন—
"কেমন হলো?"
তার উত্তরে আমরা যা-ই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে উত্তরটা বোধহয় সবারই জানা।
খুব ভালো।
কারণ আমরা professional actor, singer বা dancer নই।
আমরা শুধু কিছু মানুষ, যারা নিজেদের ব্যস্ত জীবনের মাঝখান থেকে একটু একটু সময় বের করে একসঙ্গে কিছু তৈরি করেছি।
আর সেই কারণেই হয়তো পুজো শুরু হওয়ার অনেক আগেই আমাদের পুজো শুরু হয়ে যায়।
প্রথম ঢাকের শব্দে নয়—প্রথম "rehearsal কবে?" message-টাতেই।

Debraj Ghosh, 11 years

Riyanshi Das, 11 years

Auro Biswas, 4 years

Arush De

Aarit Chakraborty, 12 years

Abhyuday Das, 10 years

Ahiri Sarkar, 8 years

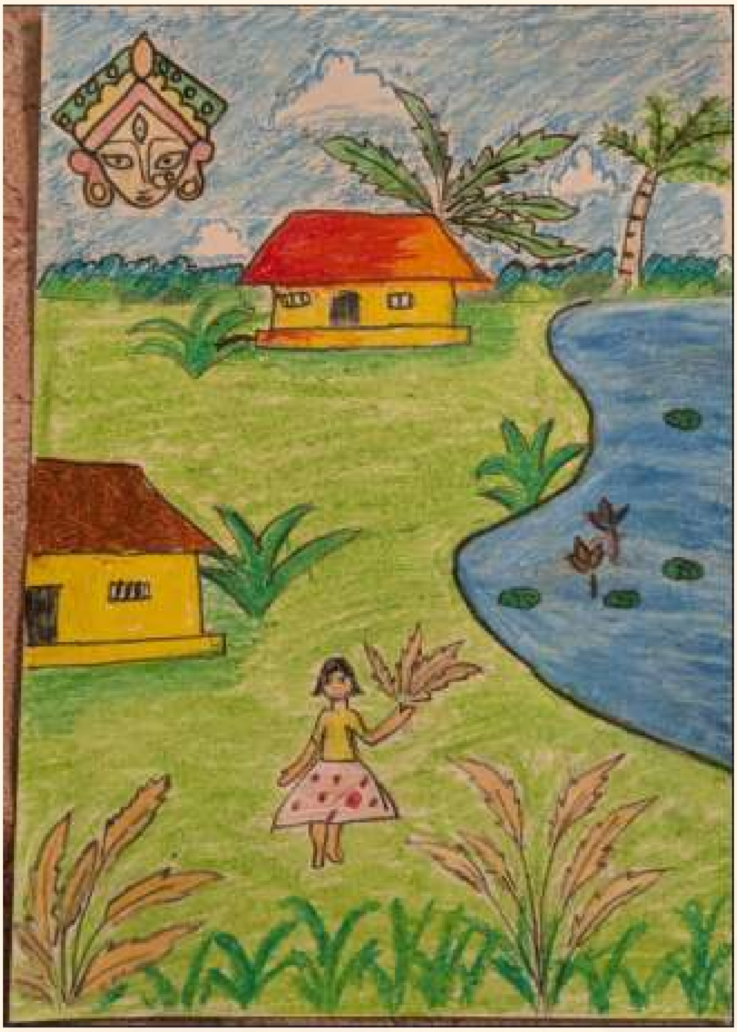

Kiyan Mukherjee, 8 years

Papia Chatterjee

আজবগড়ের গল্প -কথা (দ্বিতীয় অধ্যায়)

-Arnwesha Jana

আজবগড়েরনতুন কথা, মগজধোলাই সবইবৃথা,
তৈরীকরা কৃতি-মানুষ ভেঙেদিলো মিথ্যে ফানুস।
বদলদেখে সব্বাই খুশি, খালি দু- একজনেরগড়িমসি।
আজবগড়েরফিরবে নাকি এবার ডেমোক্রেসি;।
´দশেমিলে করি কাজ´ -হবে নতুন পলিসি।
নতুনআলোয় উঠবে ভোরে দেশটি আজবগড় ;
এই কামনায় করছে সবাই দিবারাত্রিনিরন্তর।
তবুওঅবুঝ মনের কোন জমেএকরাশ প্রশ্নের ভিড়,
আজবগড়আদৌ বদলে হবে তো শান্তিরনীড়?
যেখানে হিংসানয়, কুৎসা নয়, আর হবেনা নয়কে হয়;
ঘুচবে সবার মনের ভয়, মিথ্যে ভেঙে হবে সত্যের জয়।

Papia Chatterjee

ছবিটি একটি প্যাঁচার। আমার মতে প্যাঁচা হলো পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর পাখি। এত সুন্দর একটি পাখি কে আমাদের বাংলা সংস্কৃতি তে কেনো যে একটা কুৎসিত রূপ দেওয়া হয়েছে সেটা আমি কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারি না।

প্যাঁচা টির পরিচয়।

ইংরেজি নাম জঙ্গল আউলেট (jungle owlet) বা ব্যার্ড জঙ্গল আউলেট(barred jungle owlet)। Scientific নাম গ্লসিডিয়াম রেডিয়াটাম (Glaucidium radiatum)। এটি আকারে ছোট হয়, 20 সেন্টিমিটার এর কাছাকাছি। এটি resident bird, অর্থাৎ এটি পরিযায়ী পাখি নয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়।

নাম জঙ্গল আউলেট হলেও এর গভীর জঙ্গলে থাকে না। Dry deciduous forests, moist deciduous forest, woodland, forest edge এও এদের দেখা যায়। এরা আকারে ছোট হলেও বেশ দক্ষ predator। Beetle, grasshopper, locust, ছোট টিকটিকি, ছোট পাখি, কখনও বা ছোট ব্যাঙ এরা খেয়ে থাকে।

এই কাল প্যাঁচার শিকার করার কায়দা টাও বেশ সুন্দর। একটি উঁচু perch এ বসে চারপাশ লক্ষ্য করে, তারপর হঠাৎ নিচে ঝাঁপিয়ে নিজের শিকার ধরে। এরা মূলত ভোর ও সন্ধ্যার সময় বেশি সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ এরা crepuscular। তবে এরা সম্পূর্ণ রাতচড়া নয়। অনেক সময় দিনেরবেলা তেও শিকার বেরোয়। এবং কখনও কখনও রোদেও বসে থাকে।

এরা নিজেদের বাসা অন্য পাখিদের মতন নিজে তৈরি করে না। সাধারণত বড়ো গাছের কোটর এর ভিতর ডিম পাড়ে। ভারতে, March-May এই কয় মাস এরা বাচ্চা পাড়ে।

||হাটখোলা দত্তবাড়ির দুর্গাপুজো||

হাটখোলা দত্তবাড়ি উত্তর কলকাতার ৭৮, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে। বর্তমানে যে বাড়ির পুজোটিকে আমরা “হাটখোলা দত্তবাড়ির পুজো” বলে চিনি, তার সূচনা ১৭৯৪ সালে জগৎরাম দত্তের হাতে। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাটনা শাখার দেওয়ান ছিলেন।

এই দত্ত বাড়ির থাকুরদালান টি খুবই বিখ্যাত। কথিত আছে যে, জগৎরাম দত্ত যখন বাড়িটি তৈরি করেন, তখন দ্বারকা, পুরী, কাশী, হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থ স্থান থেকে পবিত্র মাটি নৌকা তে করে কলকাতায় আনা হয়েছিল। সেই মাটি ব্যবহার করেই বাড়ির উত্থান ও ঠাকুরদালান তৈরি হয়েছিল, এইরকম ইতিহাস এ বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই পরিবার এর পুজোর কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য:-

১. কাঠামো পুজো হয় উল্টরথের দিন। তারপর শ্রাবণ মাস থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়।

২. প্রতিমার চালচিত্র এখানে মথচৌরীর আকৃতির হয় এবং তাতে মাটির অলঙ্করণে কৃষ্ণলীলা ও চণ্ডীর কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়।

৩. এখানে কার্তিকের সাজ ও আলাদা। কার্তিক কে এখানে সৈনিকের পোশাকে সাজানো হয়।

৪. দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজোয় ভোগের ও বিশেষ নিয়ম আছে। ঐতিহ্য অনুযায়ী ভোগে চাল ও আলু ব্যবহার করা হয় না।

৫. একটি অত্যন্ত অভিনব রীতি আছে এই পরিবার এর পুজো তে। প্রতীকী বলি হিসাবে এখানে ক্ষীরের পুতুল নিবেদন করা হয়। জীব বলি এই পরিবারে নেই কারণ এই দত্ত পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম তে বিশ্বাসী।

হাঠখোলার দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজোর সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি ও জড়িয়ে আছে কিছু টা। এই পরিবার এর মানুষ জন মা দুর্গা কে শুধু মাত্র শক্তিরুপিনি রূপের সাথে দেশমাতৃকা রূপে ও পুজো করে এসেছে এতকাল। বিসর্জন এর পর বাড়ি ফেরার সময় "বঙ্গ আমার জননী আমার" এই গান টি গাওয়া হয়। ফলে বিসর্জনের মুহূর্তটিও দত্তরা নিছক ধর্মীয় আচার এর পাশাপাশি এক ধরনের সেদেশ স্মরণ এর সঙ্গেও যুক্ত করেছে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মা, শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখিত আছে।

এই লেখার সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে সেটি আমার নিজের তোলা। ছবি তে পুরোহিত দের সঙ্গে পুজোর কাজে কর্মরত, বাড়ির বর্তমান বড়ো বৌ কে দেখা যাচ্ছে।

Glimpses of Kumortuli

-Srijani Panda

In the winding lanes of Kumortuli, the arrival of Durga Puja begins long before the drums of the festival are heard. Here, amidst the scent of wet clay and the soft glow of workshop lights, artisans bring Maa Durga to life—layer by layer, stroke by stroke. Their hands shape not just clay, but the fierce grace of her eyes, the serenity of her face, and the quiet power of her presence. For generations, these craftsmen have devoted themselves to this sacred transformation, turning earth into the goddess who will soon enter countless homes and pandals across Bengal. In every curve, every brushstroke, and every carefully painted eye lives a devotion that is deeply intimate and rooted in the soul of Bengal. In Kumortuli, the spirit of Durga Puja is born in clay, long before it fills the streets with light, music, and celebration.

কলকাতা—এক টুকরো নস্টালজিয়া

-Srijani Panda

As the sun sets over the Ganges, the Second Hooghly Bridge and drifting boats become silhouettes against Kolkata's golden horizon.

Victoria Memorial glowing beneath the night sky, its white marble rising in quiet grandeur over Kolkata.

Kolkata's iconic yellow taxi—a timeless symbol of the city's character, charm, and nostalgia

Gourav Halder & Rakasree Ghosh

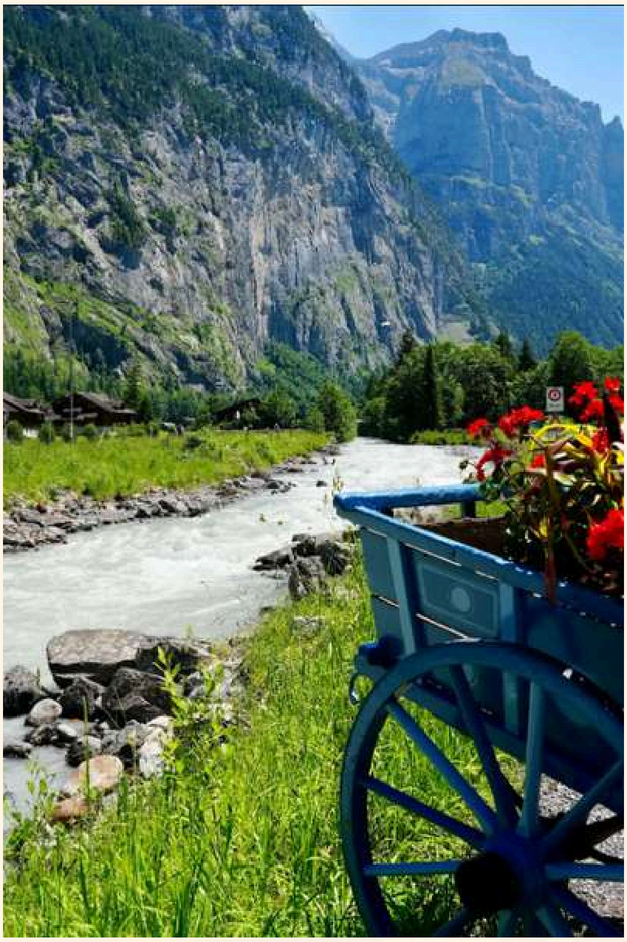

Lauterbrunnen Valley, Switzerland

Lauterbrunnen Valley, Switzerland

Innsbruck, Austria

Hallstatt, Austria

Hintersee, Bavaria, Germany

Innsbruck, Austria

@goingoffmap

একসাথে, একটু দূরে

- কলমে রামধনু

(১)

'খিঁচুড়িটা একটুটিফিন বক্সে ভরে দিতে পারবে?' একটু জোরেই ডাক দিল পর্ণা। 'কাল ভোর পাঁচটায়বেরোব। পথে ক্ষিদে পেলেকাজে লাগবে।'
পাশেরঘর থেকে সাড়া দিলনীল, 'আসছি।'
সেদিনছিল শুক্রবার রাত। কাল উইকেন্ড।অনেকদিন পর নীলের টানাকয়েক দিনের ছুটি। কাল খুব ভোরেদুজনে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান।
ঘড়িতেতখন রাত সাড়ে দশটারমতো হবে। ঘরময় ব্যাগগোছানোর ব্যস্ততা। পর্ণা জামাকাপড় গুছিয়ে খিঁচুড়িটাও রেডি করে ফেলেছে , পাশের ঘরে নীল শেষমুহূর্তের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে।
নীলঘর থেকে বেরিয়ে এল।
পর্ণারগায়ে নীল রঙের একটাঘরোয়া সোয়েটার। এলোমেলো চুলগুলো আলগা করে খোঁপায়বাঁধা। ঘরের মৃদু আলোয়তাকে আরও আপন, আরওমায়াবী লাগছিল। সারাদিনের ব্যস্ততার পরেও মুখের সেইচেনা হাসিটুকু যেন ক্লান্তিকে হারমানিয়েছে।
হেসেনীল বললো -আমি ভেবেছিলাম বেড়াতেযাচ্ছি, তুমি দেখছি পুরোপিকনিকের ব্যবস্থা করে ফেলেছ!
পর্ণাবললো - তোমাকে আমি চিনি। পথেবেরিয়েই বলবে, 'খিদে পেয়েছে, কিছুখেতে দাও'।
'তাঠিক '- নীল বললো
আড়চোখেতাকিয়ে পর্ণা বললো -তাই আগে থেকেইপ্রস্তুতি।
নীল মৃদু হেসে বলল,
— খিচুড়ি, আলুভাজা, আচার, জল... আর কিছু লাগবে, ম্যাডাম?
পর্ণা বলল,
— হ্যাঁ, মোবাইলের চার্জারটা ব্যাগে রেখেছ তো?
নীল হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল,
— উফ! একদম ভুলে গেছি।
পর্ণা মুচকি হেসে বলল,
— দেখলে? আমি না থাকলে তুমি অর্ধেক জিনিসই ফেলে যেতে।
নীল হেসে উত্তর দিল,
— তাই তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।
পর্ণা ভ্রু কুঁচকে মিষ্টি গলায় বলল,
— বেশি মিষ্টি কথা বলে লাভ নেই। সব গুছিয়ে এবার একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোও। কাল কিন্তু ভোরে উঠতে হবে।
নীল ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে বলল,
— আচ্ছা। তবে একটা কথা...

— আবার কী?
— কাল অ্যালার্ম বাজার আগেই তোমাকে ডেকে দেব।
পর্ণা মুচকি হেসে বলল,
— তুমি ডাকলে আবার অ্যালার্মের দরকার হয় নাকি?
কথাটা শুনে দুজনেই হেসে উঠল।
বাইরে তখন হালকা বৃষ্টি পড়ছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো টুপটাপ শব্দ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছিল রাতের নীরবতায়।

নীলআর পর্ণার বিয়ে হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। বিয়ের প্রথমক'টা দিন কেমনযেন স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের আনাগোনা, নতুন সংসার, নতুনসম্পর্ক, হাসি-আড্ডা আরছোটখাটো অভিমান মিলিয়ে সময় যেন ডানামেলে উড়ে যাচ্ছিল।
কিন্তুসুখের দিনগুলোর মাঝেই হঠাৎ এসে পড়েছিলবাস্তবের ডাক।
চাকরিসূত্রেনীলকে পাড়ি দিতে হয়েছিল ইংল্যান্ডে।বহুজাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পেকাজের সুযোগ মিলেছিল তার। বিয়ের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তাই নতুন বউকেনিয়ে অচেনা এক দেশে নতুনজীবন শুরু করার প্রস্তুতিনিতে হয়েছিল দু'জনকেই।
প্রথমদিকেসবকিছুই ভীষণ অচেনা লাগতপর্ণার। কলকাতার ব্যস্ত রাস্তা, বিকেলের চায়ের দোকান, পাড়ার চেনা মুখগুলো যেনহঠাৎ করেই বহু দূরেরকোনো স্মৃতি হয়ে গিয়েছিল। মাসখানেক হলো তারাএসে উঠেছে ইংল্যান্ডের ছোট্ট মফস্বল শহর ওয়ারিংটনে। শহরটালন্ডনের মতো ব্যস্ত নয়, আবার গ্রামের মতো নির্জনও নয়।ছিমছাম রাস্তা, লাল ইটের বাড়ি, দূরে সবুজ মাঠ আরপ্রায় প্রতিদিনের মেঘলা আকাশ শহরটার নিজস্বএক সৌন্দর্য তৈরি করেছে।
তাদেরঅ্যাপার্টমেন্টটা দ্বিতীয় তলায়। বড় নয়, আবার ছোটওনয়। একটা শোবার ঘর, ছোট্ট ড্রইংরুম, খোলা রান্নাঘর আরএকটা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে দূরে রেললাইনের একটাঅংশ দেখা যায়। মাঝেমাঝে ট্রেন চলে গেলে পর্ণাঅনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, ট্রেনটাবুঝি কোথাও যাচ্ছে, যেখানে তার নিজের বাড়িটাওআছে।
কালতারা কিছুটা দুরে একটি বিস্তীর্ণজলাধারের ধারে বেড়াতে যাবে। ডোভস্টোনরিজার্ভয়ার । লেক বললে যেন তারগভীরতা আর নীরবতার পুরোপরিচয় মেলে না, জলাধারনামেই সে বেশি মানায়।
গত একমাসে নীল অফিস আর পর্ণা নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে কোথাও বেরোনোর সুযোগই করে উঠতে পারেনি। তাই কালকের এই ছোট্ট ভ্রমণ যেন তাদের ক্লান্ত দিনগুলোর ফাঁকে এক চিলতে মুক্তি, একটু স্বস্তির নিশ্বাস।
রাতটা ছিল শান্ত। বাইরে হালকা বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ, আর তার সঙ্গে মিশে ছিল ঘরের নিস্তব্ধতা।
একটা বড় হাই তুলে নীল বলল,
— আমি শুতে গেলাম। আর বেশি দেরি কোরো না, কাজগুলো গুছিয়ে তাড়াতাড়ি শোবে চলো।
পর্ণা মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।
— হ্যাঁ, তুমি যাও। আমি আসছি।
কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্ণা সব কাজ গুছিয়ে নিল। ঘরের একে একে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শেষবারের মতো চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল সে।
বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার ঘরে শুধু জানালার ফাঁক দিয়ে আসা আবছা আলো আর বৃষ্টির মায়াবী শব্দ—রাতটাকে আরও নিস্তব্ধ, আরও আপন করে তুলেছে।
নীল এরই মধ্যে বিছানায় গিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। চোখে তখন ঘুমের ছাপ, তবু পর্ণার জন্য অপেক্ষা করছিল সে।
পর্ণা ঘুমোতে যাওয়ার আগে একবার রান্নাঘরের দিকে গেল। ওভেনের সুইচটা বন্ধ আছে কি না, ভালো করে দেখে নিল। সবকিছু ঠিকঠাক আছে নিশ্চিত হয়ে তারপর ধীর পায়ে ঘরের দিকে ফিরে এল।
ঘরে এসে দেখল, নীল ইতিমধ্যেই বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে। পর্ণাকে আসতে দেখে আধঘুমে চোখ মেলে তাকাল সে। নীল একটু সরে গিয়ে বিছানায় পর্ণার জন্য জায়গা করে দিল। তারপর হালকা হেসে চোখ বন্ধ করল। পর্ণা এসে ধীরে ধীরে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

(২)

অ্যালার্মেরশব্দে নীলের ঘুম ভেঙে গেল।ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলভোর ৪টা ৩০। আজএকটু তাড়াতাড়িই উঠতে হবে। পাশফিরে পর্ণাকে আলতো করে ডাকল।
"পর্ণা, ওঠো। ভোর ছটার মধ্যেরেডি হতে হবে।"
পর্ণাচোখ মেলে নীলের দিকেতাকাল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠেবলল, "এত তাড়াতাড়ি? আরপাঁচ মিনিট..."
নীলহেসে বলল, "পাঁচ মিনিট বলতেবলতে আবার আধঘণ্টা কেটেযাবে। ওঠো, না হলেদেরি হয়ে যাবে।"

বাইরেতখনও হালকা অন্ধকার। রাতের বৃষ্টির কারণে বাতাসে একটা শীতলতা। পর্ণাঅনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠল।
রাতেরবৃষ্টির পরে আকাশ একেবারেপরিষ্কার। দুজনেই দ্রুত ফ্রেশ হয়ে প্রস্তুতি নিতেলাগল।
ছটারএকটু আগেই তারা তৈরি।রান্নাঘর থেকে গরম চায়েরভাপ উঠছে। জানালার বাইরে পূর্ব আকাশে ধীরে ধীরে আলোফুটছে।
ফ্লাস্কেচা ভরে ঢাকনাটা ভালোকরে বন্ধ করল পর্ণা।আদুরে গলায় বলল, “এত সকালে বেরোনোরআলাদা একটা মজা আছে, তাই না?”
নীলমৃদু হেসে মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ। মনে হয় পুরোপৃথিবীটা এখনও ঘুমিয়ে আছে, আর আমরা নতুন একটাদিনের শুরু দেখতে পাচ্ছি।”
দুজনেইচুপচাপ এক মুহূর্তের জন্যআকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল।সামনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেনতুন এক যাত্রা, নতুনএক দিন।

নিস্তব্ধতাভেঙে নীল বলল, "আচ্ছাশোনো, আমাকে এটিএম থেকে একটু টাকাতুলতে হবে। আমি বেরোই? তুমি কি বেরিয়ে বাসস্টপেচলে আসতে পারবে? ৬:৩০-এর ট্রেন, দেরি কোরো না কিন্তু।আমি এটিএম থেকে টাকা তুলে৬:২০ নাগাদ স্টেশনেপৌঁছে যাব। তুমিও ওইসময়ের মধ্যেই পৌঁছানোর চেষ্টা করো। হাতে ৫মিনিট সময় থাকা ভালো।"
পর্ণা মৃদুভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।
নীলবেরিয়ে গেল। ইংল্যান্ডে এখনগ্রীষ্মকাল চলছে, তাই আবহাওয়ায় আজশীতের তেমন কোনো ছোঁয়ানেই। আকাশে হালকা সোনালি রোদ ছড়িয়ে আছে, বাতাসও বেশ নরম ওআরামদায়ক। নীল গায়ে চাপিয়েছেহালকা আকাশি রঙের একটি স্পোর্টসজ্যাকেট। আসলে ওর বরাবরইএকটু বেশি শীত লাগে।অন্যরা যখন পাতলা পোশাকেঘুরে বেড়ায়, নীল তখনও সঙ্গেএকটা জ্যাকেট রাখতে ভুল করে না।পর্ণার নীল রংটা ভীষণপ্রিয়। তাই ওই জ্যাকেটটাসে আগেই হাতের সামনেরেখে দিয়েছিল, পরার জন্য।

দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে নীল এটিএমের দিকেরওনা দিল। এটিএমটা সেন্ট্রালবাসস্টপের ঠিক পশ্চিম দিকে, সিটি সেন্টারের রাস্তায় একটু এগোলেই। নীলদ্রুত পায়ে সেখানে পৌঁছে দেখল, এই সকালবেলাতেও দু'জন মানুষ ইতিমধ্যেলাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটাদীর্ঘশ্বাস ফেলে লাইনের শেষমাথায় গিয়ে দাঁড়াল।মিনিটগুলো যেন আজ অস্বাভাবিকধীরে এগোচ্ছিল। একসময় তার পালা এল।তাড়াতাড়ি টাকা তুলে বেরিয়েএসে নীল ঘড়ির দিকেতাকাল। কাঁটা তখন ঠিক ৬টা১৫ ছুঁয়েছে।তার ঠোঁটের কোণে স্বস্তির একটিক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।এখনও হাতে সময় আছে। তবে পর্ণাকে অপেক্ষা করাতে সে চায় না।তাই টাকাগুলো মানিব্যাগে গুছিয়ে রেখে সে দ্রুতপায়ে ওয়ারিংটন সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে হাঁটা দিল।

৬টা২০ বাজতে না বাজতেই নীলবাসস্টপে পৌঁছে গেল । কিন্তুচারদিকে তাকিয়েও সে কোথাও পর্ণাকেদেখতে পেল না। অকারণেইতার মনে হালকা একটাঅস্থিরতা দানা বাঁধল।
ওদিকেঘড়ির কাঁটা ছয়টা পঁচিশের ঘর ছুঁইছুঁই করছে।সকালের নরম আলো ধীরেধীরে নেমে আসছে স্টেশনেরওপর। ঠিক সেই সময়গর্জন তুলে ট্রেনটা এসেথামল প্ল্যাটফর্ম নম্বর দুইয়ে। যাত্রীদের ভিড় মুহূর্তের মধ্যেনড়েচড়ে উঠল, কেউ নামছে, কেউ উঠছে, কেউ বা ব্যস্তচোখে কাউকে খুঁজছে।
নীলেরবুকের ভেতরটা অদ্ভুত অস্থিরতায় কাঁপছিল। সে দ্রুত পকেটথেকে ফোনটা বের করে পর্ণারনম্বরে কল করলো। একবার... দু'বার... তিনবার... ফোনের ওপারে শুধু রিংটোন বেজেচলল। কিন্তু পর্ণা ফোন ধরল না।

নীল ঠোঁট কামড়ে চারপাশে তাকাল। প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে কি কোথাও পর্ণা আছে? নাকি সে এখনও আসেনি? আবার কল করলো সে। একই অবস্থা। রিং বেজে চলেছে অবিরাম, অথচ ওপাশ থেকে কোনো সাড়া নেই। অজানা এক আশঙ্কা ধীরে ধীরে তার মনে বাসা বাঁধতে শুরু করল। সকালের ব্যস্ততার মাঝেও নিজেকে হঠাৎ ভীষণ একা বলে মনে হলো তার।

ছটাত্রিস হয়ে গিয়েছে। ট্রেনেরদরজা ধীরে ধীরে বন্ধহয়ে গেল, তারপরই সিটিবজিয়ে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অথচ পর্ণারএখনও কোনো দেখা নেই।
নীলঅসহায় ভঙ্গিতে ঝপাস করে প্ল্যাটফর্মেরএকটা ফাঁকা সিটের ওপর বসে পড়ল।ট্রেনটা মুখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল। আজ ছুটিরদিন, পরের ট্রেন আবারএক ঘণ্টা পর। কথাটা মনেহতেই বিরক্তিতে তার বুকের ভেতরটামোচড় দিয়ে উঠল।
সবকিছুতো ঠিকঠাকই ছিল। সকাল থেকেদুজনেই প্রস্তুত ছিল সময়মতো বেরোনোরজন্য। তাহলে শেষ মুহূর্তে এমনকী হলো যে পর্ণাএসে পৌঁছাতে পারল না? নীলেররাগটা ধীরে ধীরে নিজেরদিকেও ঘুরে গেল। নিজেরওপরই বিরক্ত লাগতে শুরু করল তার।
অভিমান, বিরক্তি আর অকারণ দুশ্চিন্তারভিড়ে ডুবে ছিল নীল।হঠাৎই তার চোখ চলেগেল প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তের দিকে।রাস্তার ওপারে দ্রুত পায়ে ছুটে আসছে একটাপরিচিত অবয়ব।
পর্ণা।
একমুহূর্তের জন্য নীলের বুকথেকে যেন একটা ভারনেমে গেল। কিন্তু সেইস্বস্তিকে ছাপিয়ে গেল জমে থাকারাগ আর অভিমান। তারচোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। এতক্ষণযার জন্য উৎকণ্ঠায় বুককাঁপছিল, তাকে চোখের সামনেদেখতে পেয়েও হাসতে পারল না নীল।শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পর্ণার দিকে, যেন তার দেরি করেআসার সমস্ত হিসেব আজ একবারে মিটিয়েনেবে।
পর্ণাওদূর থেকেই ট্রেনটার চলে যাওয়া দেখেফেলেছিল। হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মে এসে নীলের সামনেদাঁড়াল সে। মুখে ঘাম, শ্বাসটা একটু দ্রুত, কিন্তুকোনো অজুহাত দিল না। কোনোকথা বলল না।
নীলওমুখ খুলল না। এতক্ষণধরে জমে থাকা রাগ, অভিমান আর অপেক্ষার কষ্টযেন সব মিলেমিশে গলায়দলা পাকিয়ে আছে। বলতে চেয়েওকিছু বলতে পারল না।
প্ল্যাটফর্মের এক কোণে পাশাপাশি বসে রইল দুজন। চারপাশে মানুষের কথাবার্তা, ট্রেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, অথচ তাদের মাঝখানে নেমে এসেছে এক অদ্ভুত নীরবতা।
পর্ণাএকবার নীলের দিকে তাকাল, আবারচোখ সরিয়ে নিল। নীলও অন্যদিকেমুখ ফিরিয়ে রইল। দুজনেই যেনবুঝতে পারছে, এই নীরবতার আড়ালেঅনেক কথা জমে আছে।কিন্তু সেই কথাগুলো বলারসাহস কারও হচ্ছে না।
সময়যেন একটু ধীর হয়েগেল। শেষ পর্যন্ত পর্ণাধীরে ধীরে নীলের হাতটাধরল। তারপর খুব আস্তে বলল,
"সরি..."
একটামাত্র শব্দ। কিন্তু সেই শব্দের ভেতরেইছিল দৌড়ে আসার ক্লান্তি, সময়মতোনা পৌঁছানোর আক্ষেপ, আর নীলকে অপেক্ষাকরানোর অপরাধবোধ।
নীলকিছুক্ষণ চুপ করে রইল।তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের রাস্তারদিকে তাকিয়েই বলল,
"একবার ফোনটাতো ধরতে পারতে।"
আবারনীরবতা নেমে এল। তবেএবার সেই নীরবতায় আগেরমতো দূরত্ব ছিল না। সেখানেছিল অভিমানের ফাঁকে ফাঁকে মিলনের একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা।
পর্ণারকপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, এলোমেলো চুলগুলোমুখের ওপর এসে পড়েছে।কয়েক মুহূর্ত শ্বাস সামলে নিয়ে সে নরম গলায়বলল,
"তুমি বেরিয়েযাওয়ার পর আমিও ঠিকঠাকইবেরোচ্ছিলাম। কিন্তু কী যে হয়েগেল! কিছুতেই সময়মতো তৈরি হতে পারলামনা। তারপর যখন ঘড়ির দিকেতাকালাম, দেখি অনেক দেরিহয়ে গেছে। তাই দৌড়ে আসছিলাম।"
একটুথেমে অপরাধীর মতো চোখ নামিয়েনিল পর্ণা।
"তোমার ফোনওশুনতে পাইনি। ব্যাগের ভেতরে ছিল, রিং হচ্ছিলবুঝতেই পারিনি। বিশ্বাস করো, এভাবে ট্রেনটামিস হবে আমি নিজেওভাবিনি।"
নীলেরদিকে তাকাল সে। চোখে স্পষ্টঅনুতাপ।
"খুব রাগকরেছ, তাই না? করাটাইস্বাভাবিক। কিন্তু সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে করিনি। আরকখনও এমন হবে না।প্লিজ, রাগ কোরো না।"

কথাগুলোবলতে বলতে পর্ণা আলতোকরে নীলের হাত ছুঁয়ে দিল।তার কণ্ঠে ছিল আন্তরিক অনুশোচনা, আর চোখে একরাশ অভিমানমেশানো অনুরোধ।
নীলেরভেতরের বরফটা ধীরে ধীরে গলতেশুরু করেছে। এতক্ষণ যে রাগ আরঅভিমান বুকে জমে ছিল, তার অনেকটাই যেন উবে গেল।তবু মুখে কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না সে।

এসবেরমাঝেই কখন যে আধঘণ্টাকেটে গেছে, তা দুজনের কেউইটের পায়নি। রাগ, অভিমান, অনুতাপআর মান-অভিমানের কথারভিড়ে সময় যেন নিঃশব্দেএগিয়ে চলেছে।
প্ল্যাটফর্মেরডিজিটাল স্ক্রিনে হঠাৎ ভেসে উঠলপরের ট্রেনের সময়, ৭টা ২৫। অন্যমনস্কচোখে ওরা দুজনেই স্ক্রিনেভেসে ওঠা সংখ্যাগুলোর দিকেতাকাল। তারপর ধীরে ধীরে পরস্পরেরচোখে চোখ রাখতেই দুজনেরঠোঁটেই ফুটে উঠল হালকাহাসি। অপেক্ষার অবসান যেন আর বেশিদূরে নয়। দুজনের চোখেইজ্বলে উঠল এক নিঃশব্দউজ্জ্বলতা, যা শব্দ ছাড়াইঅনেক কথা বলে দিচ্ছিল।
নীলবলল, “চলো, স্টেশনটা একটুঘুরি। এখনও তো অনেকটাসময় বাকি।”পর্ণা মৃদু হেসে বলল, “চলো, তবে প্ল্যাটফর্মে দশমিনিট আগে ফিরে আসব।”
নীলঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।
দুজনেপাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। স্টেশনেরভিড়, দোকানগুলোর আলো, মানুষের আসা-যাওয়া, সবকিছুই যেন তাদের কাছেআজ অন্যরকম লাগছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকেকখনও নেমে আসছিল নীরবতা, আবার কখনও হালকা হাসিতেভেঙে যাচ্ছিল সেই নীরবতা।এভাবেই কেটেগেল আরও কিছুটা সময়।
ঘড়িতেতখন সাতটা পনেরো। পর্ণা একবার কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, “চলো, এবার ফিরে যাই।ট্রেন আসতে আর বেশিদেরি নেই।”
নীলমাথা নাড়ল।
দুজনেআবার প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে লাগল।

(৩)

ওয়ারিংটন সেন্ট্রালের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে নীল আর পর্ণা। চারপাশে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা, ট্রেনের অপেক্ষায় ছুটে চলা পায়ের শব্দ—তবু তাদের দুজনের কাছে যেন এই মুহূর্তে পুরো পৃথিবীটা একটু ধীর হয়ে গিয়েছিল।
ঘড়িরকাঁটায় তখন সকাল সাতটাবাইশ। ঠিক সেই সময়ট্রেনটি ধীরে ধীরে স্টেশনেএসে ঢুকল। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল চাকার ঘর্ষণেরশব্দ আর ভোরের ব্যস্ততারআবহ। ট্রেনটা এসে থামতেই দুজনেউঠে পড়ল। ট্রেনে উঠেওরা জানালার ধারের দুটি আসন নিল।জানালার পাশের সিটটা পেয়ে পর্ণা চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে রইল। ওয়ারিংটন সেন্ট্রালছেড়ে ট্রেনটি ধীরে ধীরে এগিয়েচলল ম্যানচেস্টার পিকাডিলির উদ্দেশে। নীল মাঝে মাঝেজানালার কাঁচে প্রতিফলিত পর্ণার মুখটার দিকে তাকাচ্ছিল। রোদসরিয়ে কুয়াশায় ঢেকেছে চারপাশ । জানালার ওপারেকুয়াশার পাতলা পর্দা ভেদ করে একেরপর এক সবুজ মাঠপিছিয়ে যেতে লাগল, যেনসময়ের ডায়েরির পাতা উল্টে যাচ্ছেঅদৃশ্য কোনো হাতে।
বাইরেইংল্যান্ডের সবুজ মাঠ, ছোটছোট বাড়ি আর দূরে মিলিয়েযাওয়া আকাশ ছুটে যাচ্ছিল; আর ভেতরে, দুটো হৃদয় যেনঅদৃশ্য কোনো ছন্দে আরওকাছে আসছিল।
হঠাৎপর্ণার মাথার কয়েকগাছি চুল উড়ে এসেআলতো করে ছুঁয়ে গেলনীলের গাল। মুহূর্তেই তারশ্যাম্পুর মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠল নীলেরনাক, মুখ, মন।
নীলকিছু বলল না। শুধুসেই চুলের মৃদু স্পর্শ আরপরিচিত সুবাসটুকু নীরবে অনুভব করতে লাগল। পর্ণাটের পেয়ে লাজুক হেসে চুলগুলো সরিয়েনিল।
সেআবার জানালার দিকে তাকাল, কিন্তুঠোঁটের কোণে লুকিয়ে রাখাহাসিটা নীলের চোখ এড়াল না।
পর্ণাহেসে বলল, — “জানো, ট্রেনের জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভালোলাগে।”
নীল মৃদু হেসে উত্তর দিল, — “আমারও... “

রেললাইনেরউপর চাকার ছন্দময় শব্দ এক অদ্ভুতসুর তুলেছিল, ঝিক্ ঝিক্, টক্টক্, যেন দূর আকাশেরকোনো অচেনা গায়ক লোহার তারেগান ধরেছে - তাদের নীরব ভালোবাসার ব্যাকগ্রাউন্ডমিউজিক।
ছোটছোট স্টেশনগুলো মুহূর্তের জন্য সামনে এসেদাঁড়ায়, তারপর আবার হারিয়ে যায়স্মৃতির মতো। সারি সারিইটের বাড়ি, ভেজা ছাদের ঝিলিক, নির্জন খাল আর কারখানারচিমনি মিলে ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলেরএক শান্ত সকালের প্রতিকৃতি আঁকছিল।
ট্রেনযত ম্যানচেস্টারের দিকে এগোতে লাগল, গ্রাম্য প্রশান্তি তত ধীরে ধীরেশহরের প্রাণচাঞ্চল্যে রূপ নিতে থাকল। দূরে উঁচু ভবনের রেখাচিত্রদৃশ্যমান হলো, যেন দিগন্তেরবুক থেকে এক নগরীজেগে উঠছে। শহরের দৃশ্য ধীরে ধীরে ঘনহতে লাগল। ম্যানচেস্টার এগিয়ে আসছে। কিন্তু নীলের মনে হচ্ছিল, গন্তব্যটাআসলে ম্যানচেস্টার পিকাডিলি নয়। আসল গন্তব্যহলো এমন একটা মুহূর্ত, যেখানে সময় থেমে থাকবে, ট্রেন থেমে যাবে, অথচপর্ণার পাশে বসে থাকারএই অনুভূতিটা থামবে না।
তারপরএকসময় ট্রেনটি ম্যানচেস্টার পিকাডিলির বিস্তৃত প্ল্যাটফর্মে এসে থামল। পর্ণাউঠে দাঁড়াল। নীলও তার পাশেদাঁড়াল।
যাত্রীদেরপদচারণা, ঘোষণার প্রতিধ্বনি আর শহরের স্পন্দনমিলেমিশে জানিয়ে দিল, একটি যাত্রারসমাপ্তি , কিন্তু নীল আর পর্ণারকাছে সেই পথটা হয়েরইল এক টুকরো ভালোবাসা, জানালার পাশে বসে লেখাএক অসমাপ্ত কবিতা।

(৪)

ছুটিরসকালের ম্যানচেস্টার তখনও পুরোপুরি জেগেওঠেনি। পিকাডিলি স্টেশনের কাঁচের ছাদ পেরিয়ে মৃদুরোদ এসে পড়ছিল প্ল্যাটফর্মে।চারপাশে মানুষের ব্যস্ততা, কফির গন্ধ আরট্রেনের পরিচিত শব্দের মাঝেও নীলের চোখ বারবার খুঁজেনিচ্ছিল শুধু একজনকেই—পর্ণাকে।
গ্রিনফিল্ডগামীট্রেন আসার এখনও কয়েকমিনিট বাকি। পর্ণার হাতে গরম কফিরকাপ, আর নীল ব্যস্তভাবেচারপাশের মানুষের ভিড় দেখছিল।
"আজকের আবহাওয়াটাদারুণ, তাই না?" পর্ণামুচকি হেসে বলল।
নীলমাথা নাড়ল। "হ্যাঁ, গ্রিনফিল্ডে পৌঁছালে আরও সুন্দর লাগবেমনে হয়।"
হালকানীল রঙের কোট গায়েপর্ণা। নীল রংটা তারভীষণ প্রিয়—শান্ত, কোমল এই রঙেরমধ্যে সে যেন নিজেরএকটা আলাদা স্বস্তি খুঁজে পায়। কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট একটা ব্যাগ, আরমুখে সেই চেনা মায়াবীহাসি। পাশে দাঁড়িয়ে নীল।
চারপাশেতখন স্টেশনের ব্যস্ততা। মানুষের ভিড়, ট্রেনের হুইসেল, লাগেজ টানার শব্দ—সব মিলিয়েএকটানা কোলাহল।
তবুমুহূর্তের জন্য নীলের মনেহলো, স্টেশনের সেই কোলাহল যেনকোথাও মিলিয়ে গেছে। মানুষের ভিড়ের মাঝেও তার চোখ আটকেরইল শুধু পর্ণার মুখে।
পর্ণা আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,
— কী দেখছ এমন করে?
নীলহেসে বলল,
— কিছু না। শুধু ভাবছি, এত মানুষের ভিড়েও তোমাকেই কেন সবার আগেচোখে পড়ে।
পর্ণালাজুক হেসে চোখ নামিয়েনিল। ঠিক তখনই দূরথেকে ভেসে এল ট্রেনআসার শব্দ।
গ্রিনফিল্ডগামীট্রেনটা এসে ধীরে ধীরেচার নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। নীল ঘড়িতে চোখবোলালো, ৮:১২ ।ট্রেন সঠিক সময়ে এসেছে।
দরজাখুলতেই দুজনে উঠে পড়লো ।পর্ণা জানালার পাশে বসে পড়ল।নীল পাসের সিটে । সকালেরআলো পর্ণার মুখের ওপর এসে এমনভাবেপড়ছিল, যেন ভোর নিজেইতাকে একটু বেশি সুন্দরকরে তুলতে চেয়েছে।
শহরধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতেলাগল। প্রথমে চোখে পড়ল সারিসারি ইটের বাড়ি, পুরোনোকারখানার চিমনি, ব্যস্ত রাস্তা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করল। শহরেরকংক্রিট সরে গিয়ে জানালারওপারে দেখা দিল সবুজউপত্যকা, ছোট ছোট গ্রামআর দূরের পাহাড়ের রেখা।

সকালেরশিশিরে ভেজা প্রকৃতি যেনঘুম-ভাঙা চোখে তাদেরদুজনকে দেখছিল।
গ্রিনফিল্ডযত কাছে আসছিল, পাহাড়গুলোতত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সকালেররোদ তাদের গায়ে পড়ে এক অপার্থিবসৌন্দর্য তৈরি করছিল।
পর্ণাজানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। বলল-
"দেখেছ?" এই জন্যই আমি ট্রেনে ভ্রমণভালোবাসি। মনে হয় জীবনটাকেঅন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়।"
নীল বলল, তা ঠিক।
ট্রেনতখন অ্যাশটন-আন্ডার-লাইন পেরিয়ে এগিয়েচলেছে। দূরে পেনাইন পাহাড়েরঢাল দেখা যাচ্ছে। আকাশেভেসে বেড়ানো মেঘের ছায়া সবুজ মাঠের উপরনরমভাবে পড়ছে।
পর্ণানীলের দিকে তাকাল। চোখদুটো শান্ত, কিন্তু গভীরে যেন অনেক অজানাকথা লুকিয়ে আছে।
ট্রেনযখন গ্রিনফিল্ডের দিকে ঢুকতে শুরুকরল, তখন জানালার বাইরেএক অপূর্ব দৃশ্য। ঢেউখেলানো সবুজ পাহাড়, পাথরেরছোট বাড়ি, আর গ্রামের নিস্তব্ধসৌন্দর্য।
ঘোষণাভেসে এল, "পরের স্টেশনগ্রিনফিল্ড"।
দু'জনেই ব্যাগ তুলেনিল। কিন্তু নীলের মনে হচ্ছিল, যাত্রাটাখুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল।
প্ল্যাটফর্মেনামার পর হালকা বাতাসতাদের স্বাগত জানাল। শহরের কোলাহল অনেক দূরে রয়েগেছে।
পর্ণাচারপাশে তাকিয়ে বলল, "এখানে যেন সময় একটুধীরে চলে।"
নীলমুচকি হেসে বলল, "কিছুমুহূর্তের জন্য সময়কে ধীরেচলতেই হয়।"
গ্রিনফিল্ডেরছোট্ট স্টেশন ছেড়ে তারা পাশাপাশি হাঁটতেশুরু করল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। সামনে ছিল পাহাড়, খোলাআকাশ, আর হয়তো এমনএক গল্প, যার শুরুটা হয়েছিলম্যানচেস্টার পিকাডিলির ভিড়ের মধ্যে, কিন্তু শেষ কোথায় হবেতা এখনও কেউ জানেনা।

(৫)

কিছুক্ষণপর দূরে বাসটি দেখাগেল। ঘড়িতে ঠিক নটা বাজতেইডাবল-ডেকার বাসটি এসে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াল।৩৫০ নম্বর বাসটি স্ট্যান্ড ডি -এর সামনেএসে থামতেই দরজা খুলে গেল।দোতলার এইসব বাসের উপরেরতলা থেকে ভালো দৃশ্যদেখা যায় তাই এগুলিপর্যটকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়।বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ডাবল-ডেকার বাস নিজেই একটিসাংস্কৃতিক প্রতীক।

ওরাদুজন ওঠার জন্য লাইনেদাঁড়াল। দু'জনে মিলেএকটি ফ্যামিলি ডে পাস কিনল।এতে খরচ একটু কমপড়ে। এই পাস দিয়েওই কোম্পানির যেকোনো বাসে ইচ্ছেমতো যতবারখুশি ওঠানামা করা যায়। ইংল্যান্ডেরবিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কোম্পানির বাস চলাচল করে।তাই সারাদিন ঘোরাঘুরি আর যাতায়াতের জন্যডে পাসই সবচেয়ে সুবিধাজনকও সাশ্রয়ী।
উপরেরতলায় উঠতে ও নামতেসিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়। বাসেটিকিট কেটে সিঁড়ি দিয়েওরা বাসের ওপরের তলায় উঠলো। উপরেরতলার সামনের আসনটি সাধারণত সবচেয়ে আকর্ষণীয়! তবে ওগুলিতে লোকবসে আছে। ওরাজানালার ধারের দুটি আসন নিল।
সকালের ভিড় তখনও পুরোপুরি বাড়েনি। বাসটির জানালায় কুয়াশার হালকা আস্তরণ। বাস ছাড়তেই স্টেশনের রাস্তা ধীরে ধীরে পেছনে সরে যেতে লাগল। নীল ডে পাস ব্যাগে রেখে দিনের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। তাদের গন্তব্য ডোভস্টোন রিজার্ভয়ার। বাসের ওপরের তলা থেকে চারপাশের দৃশ্য বেশ ভালো দেখা যাচ্ছিল। গ্রিনফিল্ড যেন পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে থাকা এক শান্ত, মনোরম গ্রাম। ছোট ছোট বাড়ি, সবুজে ঢাকা পথ। গ্রিনফিল্ড ছেড়ে ডোভস্টোনের দিকে এগোতে শুরু করতেই বদলে যেতে থাকে চারপাশের দৃশ্য। শহরের পরিচিত কোলাহল ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, আর তার জায়গা নিল পাহাড়ি প্রকৃতির গভীর নীরবতা।
পথেরদুপাশে উঁচু-নিচু সবুজপাহাড়, তাদের বুক চিরে নেমেআসা সরু পথ, আরদূরে বিস্তৃত উপত্যকা—সব মিলিয়ে মনেহচ্ছিল, প্রকৃতি যেন নিজের হাতেসাজিয়ে রেখেছে এক বিশাল ছবি।কখনও পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া, কখনও রোদের সোনালিআভা, আবার কখনও দূরেরউপত্যকা কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

পর্ণানীলের হাতটা আলগোছে শক্ত করে জড়িয়েধরল।
বাসটাযতই ডোভস্টোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততই প্রকৃতির সৌন্দর্য গভীর হয়ে উঠছিল। পর্ণার মনে হচ্ছিল , এইপথ শুধু একটি গন্তব্যেরদিকে নিয়ে যাচ্ছে না—বরং ধীরেধীরে এক শান্ত, অচেনাজগতের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।
বাসটিধীরে ধীরে ক্ল্যারেন্স হোটেলেরসামনে এসে থামল। নীলজানালার কাঁচে শেষবারের মতো চোখ রেখেবলল , চলো এবার নামতেহবে।
পর্ণাব্যাগটা কাঁধে তুলে বাস থেকেনামল। চারপাশে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
বাসটিকয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার পাহাড়িরাস্তা ধরে দূরে মিলিয়েগেল। তার শব্দটুকুও যখনবাতাসে হারিয়ে গেল, চারপাশে নেমেএল এক অদ্ভুত শান্তি।
নীলআর পর্ণা দাঁড়িয়ে রইল সবুজের মাঝে।
সামনেডোভস্টোন রিজার্ভয়ারের দিকে চলে গেছেএকটি সরু পথ। পথেরদুপাশে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। সকালেরনরম রোদ ঘাসের ওপরপড়ে যেন অসংখ্য ছোটছোট আলোর দানা ছড়িয়েদিয়েছে। কোথাও সাদা ভেড়ার পাল, কোথাও বাদামি-সাদা গরু মাথানিচু করে নিশ্চিন্তে ঘাসখাচ্ছে।
নীলকিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইল পর্ণার দিকে।
পর্ণাআড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,
— আবার কী দেখছ?
নীলহেসে বলল,
— নীল রংটা তোমারএত প্রিয়, সেটা জানি। কিন্তুআজ মনে হচ্ছে, নীলরঙেরও তোমাকে বেশ পছন্দ।
পর্ণাহেসে চোখ নামিয়ে নিল।
— তোমার কথার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। একটু ধীরে ধীরে হাঁটো, —"জানো, এমন জায়গায় এলে মনে হয়পৃথিবীটা কত সুন্দর হতেপারে, যদি মানুষ একটুথামতে শেখে।"
নীলতার দিকে তাকিয়ে বলল, —"হয়তোপৃথিবী সবসময়ই এমন সুন্দর ছিল।আমরা শুধু শহরের শব্দেসেটা শুনতে পাই না।"
দুজনেই হেসে উঠল।
তাদেরপায়ের নিচে সরু পথ, দুপাশে ঘাসের সমুদ্র। দূরে পাহাড়ের ঢালেমেঘের ছায়া ধীরে ধীরে সরেযাচ্ছিল। বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ, আর কোথাও কাছেই কোনো গরুর গলায়বাঁধা ঘণ্টার মৃদু শব্দ—টুং... টুং...
নীলহঠাৎ থেমে একটি ভেড়ারদিকে তাকাল। ভেড়াটিও যেন কৌতূহলী চোখেতাদের দিকে তাকিয়ে রইল।
—"ওইদেখো," নীল হেসে বলল, "ওটাও যেন আমাদের সঙ্গেডোভস্টোন যেতে চাইছে।"
পথযত এগোতে লাগল, পাহাড়গুলো তত কাছে চলেআসছিল। সবুজ ঢালেরফাঁক দিয়ে দূরে নীল আকাশদেখা যাচ্ছিল। কখনও পথটা একটুউঁচুতে উঠছিল, আবার কখনও নেমেযাচ্ছিল উপত্যকার দিকে। পর্ণা মাঝে মাঝে থেমেচারপাশ দেখছিল, আর নীল চুপচাপতার সেই বিস্মিত মুখেরদিকে তাকিয়ে থাকছিল।
আরএকটু এগোতেই একটু দূরে কয়েকটিগরু মাথা নিচু করেসবুজ ঘাস চিবোচ্ছিল। মাঝেমাঝে কোনো ভেড়া মুখতুলে পথের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন অচেনা পথিকের আগমনটুকু কৌতূহল নিয়ে লক্ষ্য করছে।

(৬)

সামনেরবাঁকটা একটু এগোতেই হঠাৎপথটা বদলে গেল। সরুরাস্তাটি ধীরে ধীরে ওপরেউঠে গেছে, যেন পাহাড়ের বুকবেয়ে কোনো অদৃশ্য গন্তব্যেরদিকে এগিয়ে চলেছে। নীল আর পর্ণাপাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সেই উঁচু পথটায়উঠতে লাগল।
কিছুটাওপরে উঠতেই পথটা এসে বাঁধেরওপর গিয়ে মিলল।
দুজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।
সামনেতাকিয়েই তাদের চোখ আটকে গেলএক অপূর্ব দৃশ্যে।
পাহাড়েরবিশাল সবুজ ঢালের মাঝখানেনীল হয়ে ছড়িয়ে আছেডোভস্টোন রিজার্ভয়ার।

শান্ত জলের ওপর আকাশেরমেঘ আর পাহাড়ের ছায়াযেন একসঙ্গে ভেসে আছে। দূরেরপাহাড়গুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, তারা নীরবে এই জলরাশিকে আগলেদাঁড়িয়ে আছে।
পর্ণাবিস্ময়ে ফিসফিস করে বলল, —“নীল... দেখো!”
নীলকিছু বলল না। শুধুমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলসামনে।
এতক্ষণযে সরু পথ, সবুজমাঠ আর পাহাড়ি ঢালপেরিয়ে তারা এসেছে, তারসমস্ত ক্লান্তি যেন মুহূর্তের মধ্যেমিলিয়ে গেল। বাতাস এসেপর্ণার চুল এলোমেলো করেদিল। নীলের মনে হলো, এইদৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথাই যথেষ্টনয়।
তারাদুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল।
সামনেডোভস্টোনের নীল জল, চারপাশেসবুজ পাহাড়, মাথার ওপরে বিশাল আকাশ—আর সেই মুহূর্তেমনে হলো, পৃথিবীটা যেনহঠাৎ অনেক বড়, অনেকশান্ত হয়ে গেছে।
পাহাড়েরবিশাল বুকের মাঝে নীল জলরাশিযেন নিঃশব্দে শুয়ে আছে। বাতাসে জলেরগায়ে ছোট ছোট ঢেউউঠছে, আর সেই ঢেউয়েরওপর আকাশের আলো রুপোর মতোঝিকমিক করছে।
পর্ণানিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।
নীলওকিছু বলল না।
কিছুদৃশ্যের সামনে শব্দ অপ্রয়োজনীয় হয়েযায়।
পেছনেপড়ে রইল ক্ল্যারেন্স হোটেল, বাসের শব্দ আর পরিচিতপৃথিবী। সামনে শুধু সবুজ পাহাড়, শান্ত জল আর দুজনমানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা।
পর্ণাআস্তে করে বলল, —“নীল, এই মুহূর্তটাযদি ধরে রাখা যেত!”
নীলদূরের জলের দিকে তাকিয়েমৃদুস্বরে উত্তর দিল, —“মুহূর্তকেধরে রাখা যায় না, পর্ণা। তবে মনে রাখাযায়।”
আরতারা দুজন দাঁড়িয়ে রইলডোভস্টোনের নীল জলের সামনে— যেন পাহাড়, আকাশআর সবুজ উপত্যকা তাদেরগল্পের পরের অধ্যায়টি নীরবেলিখে দিচ্ছে।
ডোভস্টোন রিজার্ভয়ারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নীল একের পর এক ছবি তুলতে লাগল। কখন যে সময় কেটে গেল, দুজনের কেউই টের পেল না। কখনও পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, কখনও জলের ধারে দাঁড়িয়ে, আবার কখনও হঠাৎ করে পর্ণার অজান্তে ছবি তুলে ফেলছিল তার —ক্যামেরায় একের পর এক মুহূর্ত ধরে রাখছিল ।
পর্ণা ছবিগুলো দেখতে দেখতে হেসে উঠল। কোনো ছবিতে পর্ণার মুখে প্রাণখোলা হাসি, কোনো ছবিতে নীলের দুষ্টু চোখ। আবার এমনও কয়েকটা ছবি উঠল, যেখানে দুজনেই কিছু না বলে শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—তবু ছবিগুলোতেই যেন সবচেয়ে বেশি কথা জমে রইল।
— এই ছবিটা কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছে! পর্ণা বলল ।
নীল বলল, — সুন্দর তো হবেই। ফটোগ্রাফার যে আমি!
পর্ণা ভ্রু তুলে তাকাল।
— নিজের প্রশংসা নিজেই?
নীল মুচকি হেসে বলল,
— সত্যিটা স্বীকার করতে তো লজ্জা নেই!
কথাটা শুনে পর্ণা হেসে ফেলল।
কিছুক্ষণ পর নীল পেটের দিকে হাত দিয়ে বলল,
— আচ্ছা, অনেক ছবি তো হলো। এবার আমার সত্যিই খিদে পেয়ে গেছে। চলো...
পর্ণা অবাক হয়ে বলল,
— কোথায়?
নীল মুচকি হেসে বলল,
— আর কোথায়! এবার সেই বহু প্রতীক্ষিত খিঁচুড়িটা খাই। সঙ্গে আলুভাজা আর আচার!
পর্ণার চোখে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ঝিলিক ফুটে উঠল।
— এতক্ষণে মনে পড়েছে খাবারের কথা?

নীল হেসে বলল,
— প্রকৃতি দেখতে দেখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন পেটটা মনে করিয়ে দিল!
দুজনেই হেসে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে তারা ছোট্ট পিকনিকের জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল
—সামনে পাহাড়, পাশে জলরাশি, দূরে পাহাড়ের গায়ে তখন মেঘের ছায়া নেমে এসেছে, আর তাদের ছোট্ট ব্যাগের ভেতর অপেক্ষা করছে বাড়ির স্বাদ মাখা খিঁচুড়ি।
খাওয়া শেষ করে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। চারপাশের নীরবতা আর পাহাড়ি হাওয়ায় মনটা যেন আরও শান্ত হয়ে এসেছে।
নীল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পর্ণাও ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল। তারপর কোনো কথা না বলেই নীলের হাতটা আলতো করে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিল সে।
নীল একবার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। হাতটা সরিয়ে নিল না।
চারপাশেছড়িয়ে থাকা নরম সবুজপাহাড়, তাদের গা বেয়ে নেমেআসা কুয়াশার সরু আস্তরণ, আরমাঝখানে নীলচে-ধূসর জলের বিশালবিস্তার—সব মিলিয়ে জায়গাটাকেমনে হচ্ছিল কোনো পুরোনো কবিতারপাতা থেকে উঠে আসাএক নিঃশব্দ স্বপ্ন।
জলেরওপর আকাশের মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল। কখনওরোদের ক্ষীণ আলো মেঘের ফাঁকগলে জলের বুকে এসেপড়ছিল, আবার মুহূর্তেই সবকিছুঢেকে যাচ্ছিল ধূসর আবছায়ায়। দূরেরপাহাড়গুলো কুয়াশার চাদরে অর্ধেক ঢাকা—মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি ইচ্ছে করেই তার কিছুসৌন্দর্য আড়াল করে রেখেছে।
হাওয়ায়ছিল ভেজা মাটির গন্ধ।মাঝে মাঝে দূরের কোনোপাখির ডাক এসে সেইনীরবতাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, তারপর আবার চারদিক ডুবেযাচ্ছিল গভীর শান্তিতে।
পর্ণাকিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখেবিস্ময়, মুখে এক অদ্ভুতপ্রশান্তি।
দুজনআবার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। সামনেবিস্তীর্ণ জলরাশি, দূরে সবুজ পাহাড়আর মাথার ওপর নীল আকাশ। তাদেরপায়ের শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল ঠান্ডাবাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। তাদের দুজনকে ঘিরে সেই মুহূর্তটাযেন পৃথিবীর ব্যস্ততা থেকে চুরি করেরাখা এক টুকরো সময়।
হাতেরউষ্ণতাটুকু ধরে রেখে তারাধীরে ধীরে এগিয়ে চললঅচেনা পথের দিকে—যেনপথটা যতই দীর্ঘ হোক, পাশাপাশি থাকলে তার কোনো তাড়াহুড়োনেই।
পাহাড়েরপথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছিলনীল আর পর্ণা। নীলেরহাতে পর্ণার হাত, আর দুজনেরমাঝখানে কোনো কথার প্রয়োজনছিল না।
দূরেডোভস্টোন রিজার্ভয়ারের নীলচে জল ধীরে ধীরেমেঘলা আকাশের রং ধারণ করছিল।ঠান্ডা বাতাসে পর্ণার চুলের কয়েকটা গোছা উড়ে এসেমুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল।
পর্ণা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।
নীল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল,
— কী হলো?
পর্ণা কিছুক্ষণ সামনে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে নীলের দিকে ফিরে বলল,
— জানো, এই মুহূর্তটা আমি অনেকদিন মনে রাখতে চাই।
নীল তার হাতটা আরও একটু শক্ত করে ধরে বলল,
—এই মুহূর্তটা শুধু তোমার নয়, আমারও।
পর্ণাকিছু বলল না। শুধুমাথাটা নীলের কাঁধে আলতো করে ঠেকিয়েদিল।
চারপাশেতখন সন্ধ্যা নামছে। পাহাড়ের গায়ে মিশে যাচ্ছে শেষবিকেলের আলো, জলের ওপরভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের ছায়া। দূরে কোথাও পাখিরডাক, আর তাদের পায়েরনিচে নরম পথ।
সেদিনতারা শুধু একটা জায়গায়বেড়াতে আসেনি। সঙ্গে করে নিয়ে ফিরেছিলকিছু ছবি, কিছু হাসি, কিছু খুনসুটি আর একসঙ্গে কাটানোঅসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত।
নীলআর পর্ণা হাত ধরে হাঁটতেইথাকল।
পেছনেপড়ে রইল পাহাড়, জলআর সেই বৃষ্টিভেজা বিকেল।
সামনেশুধু তাদের দুজনের পথ।

সমাপ্ত

বাঙালির জীবনে শান্তি নেই।
পনেরো বছর পর রাজ্যে নতুন ফুল ফুটিয়ে বাঙালি ভেবেছিল জমিয়ে পুজো কাটাবে। মানে, এত বছর যা হয়ে এসেছে, তাই হবে। পাঁচ দিন ধরে ঘুমের বারোটা বাজিয়ে, সুমো পালোয়ানদের মতো কার্বোহাইড্রেট খেয়ে, সামরিক অভিযানের মতো পূজামণ্ডপ পরিক্রমা। Boomer জেনারেশন হলে ব্যাগে থাকবে glucose biscuit, বগলে ভাঁজ করা ছাতা আর মুখে প্রকৃত শিল্পবোদ্ধার মতো একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। ১৯৭৫-এর পর থেকে বাংলার যে অধঃপতন শুরু হয়েছে তা তো এখনও থামেনি। তাই এই তাচ্ছিল্য তো স্বাভাবিক। আর Millennial অথবা Gen Z হলে চোখ ব্যস্ত থাকবে ফোনের ক্যামেরার লেন্সে আর মাথা catchy hashtag-এর খোঁজে। আসলে দেবী দুর্গার backdrop-এ জীবনের খুঁটিনাটি Facebook এবং Instagram-এ ডিজিটালি নথিভুক্ত করা একটা full-time কাজ।
কিন্তু সে গুড়ে বালি। শরতের মৃদুমন্দ হাওয়ার সঙ্গে এ বছর কেবল শিউলি ফুলের গন্ধই ভেসে আসছে না, বরং তার সঙ্গে মিশে রয়েছে আমলাতান্ত্রিক আতঙ্কের এক তীব্র সুবাস। বাঙালি, এমনকি মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গাও এতদিনে এক পিস যোগ্য প্রতিপক্ষ পেয়েছেন: Culture Compliance Officer।
এরা এক আজব জীব। শিক্ষা-দীক্ষা বা ধর্মীয় জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করে লজ্জা দেবেন না। এদের এক হাতে মাপজোকের ফিতে আর আরেক হাতে নকল এবং সুবিধাবাদী ধর্মীয় জ্ঞানের বই। এই দুটিকেই সম্বল করে এরা বেরিয়ে পড়েছেন মা দুর্গাকে বাঙালিদের হাত থেকে রক্ষা করতে। প্রথমেই এল খাদ্য সংক্রান্ত নিদান। কয়েকজন অফিসার কলকাতায় এসে সস্নেহে বোঝালেন যে পুজোমণ্ডপের পাঁচ মাইলের মধ্যে মাছভাজার দিকে তাকালেই আধ্যাত্মিক বিপর্যয় অনিবার্য।
গেল গেল রব উঠল।"মাছ খেতে দেওয়া হবে, খালি গরু খাওয়া বারণ", এই আশ্বাস কি তাহলে মিথ্যেই ছিল? এরপর যা ঘটল, তা রাজনৈতিক নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।নেতারা হঠাৎ করে প্রাচীন শাস্ত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও টেনে আনা হল। হঠাৎ প্রমাণ হয়ে গেল যে দেবদেবীরা আসলে বেশ আনন্দের সঙ্গেই লুচি-মাংস গ্রহণ করেন। ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকরণ, রাজনৈতিক অবক্ষয়, বাকস্বাধীনতা হরণ, রাজ্যে শিল্পের অবনতি, সবকিছুই বাঙালি মেনে নেবে। খালি দুটো বিষয় নিয়ে কিছু বললে বিদ্রোহ অনিবার্য: এক, নেতাজি, দুই, মাছ-ভাত। এ বছর আবার সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল।
এরপর আসি মাপজোকের কথায়। কুমোরটুলির শিল্পী থেকে পুজোর আয়োজক, সবাইকে দেওয়া হয়েছে কিছু friendly advice। ঠাকুর যেন ১১ ফুটের বেশি লম্বা না হয়, নইলে তাঁকে অসুরের সঙ্গে ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। মায়ের মুখ যেন যথাযথ গোলাকৃতি হয় এবং একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের মধ্যে থাকে। জামাকাপড় যেন উপযুক্তভাবে লজ্জা নিবারণ করে। অভিনব শিল্পভাবনা এখন অবাঞ্ছিত। রাষ্ট্রস্বীকৃত জ্যামিতিই নতুন আদর্শ। পরের বছর হয়তো সিংহের BMI নিয়েও কোনও নির্দেশিকা থাকবে।
এটাও বলা হল যে এ বার যেন দেবী দুর্গা এক পিস এক্সট্রা হাত নিয়ে আসেন। সবাই ভাবল এটা একটা ভুল হয়েছে। ক্ষমাও চাওয়া হল। আমি অবশ্য মনে করি এটা একটা রাজনৈতিক symbolism। রাজ্যে অনেক নতুন শিল্প আসবে, পশ্চিমবঙ্গ Gujarat Version 2.0 হবে। একটা এক্সট্রা হাত আসলে industrial growth এবং efficiency-র প্রতীক। আমি ছাড়া বাকি সবাই দাদাকে ভুল বুঝল।
আমরা অবশ্য এখনও **cultural compliance officer**-দের jurisdiction-এর বাইরে আছি। আমাদের পুজোয় সবই থাকবে। মাছ থেকে মাটন-আছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাওয়াল, তারপর ঠিক সময়ে venue-তে পৌঁছে যাওয়া (এক ঘণ্টা লেট আবার লেট নাকি কী রে বাবা!)- থাকবে। পুজোর খবর কাগজে বেরোনো-হয়েছে। পাশের পুজোর সঙ্গে ভিড় টানা নিয়ে competition - চলছে। Korean pop idol-এর মতো কার্তিক, Ozempic আছে জেনে আশ্বস্ত হওয়া পেটুক অথচ weight-conscious গণেশ, AI যদি পড়াশোনাকেই obsolete করে দেয় সেই চিন্তায় insecure সরস্বতী, Germany-র অর্থনৈতিক অধঃপতন নিয়ে চিন্তিত লক্ষ্মী এবং সবাইকে একসঙ্গে আগলে রেখে মুখে মন ভোলানো হাসি নিয়ে মা দুর্গা- সবই আছে।
এ ছাড়াও আছে কিছু বাড়তি জিনিস, যা কলকাতার পুজোয় সবসময় পাওয়া যায় না। জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। K-pop থেকে কথক, ভায়োলিন থেকে কিবোর্ড, Bollywood থেকে Tollywood, mid-life crisis-এ ভোগা কাপলদের নাচ, E-সেন বংশীয় দের নাটক, শ্রুতি নাটক, আবৃত্তি, ডেঁপো বাচ্চাদের fashion show সব থাকবে এ বার।
এ ছাড়াও থাকবে নতুন চমক। গণধোলাইয়ের সম্ভাবনা আছে জেনেও চারজন **Khatron Ke Khiladi** পুরোহিত। এদের পুজোর নীতি-নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান নতুন হলেও ভক্তি অনেক পুরোনো ।
কৌতূহল হচ্ছে?
তাহলে তো আসতেই হবে আমাদের পুজোয়। মাছের পিস একটু ছোট হতে পারে, রসগোল্লা ta গুলি র মত হতে পারে কিন্তু আন্তরিকতায় কোনও ঘাটতি হবে না, এবারও। আসলে মা দুর্গা আমাদের কাছে তো কোনও দূরবর্তী, অপ্রাপ্য স্বর্গীয় শাসক নন। তিনি বাড়ির ই মেয়ে, যিনি বছরে একবার বাপের বাড়ি ফেরেন এক বিশাল, বিশৃঙ্খল Hollywood স্টাইল Thanksgiving movie-র মতো পারিবারিক পুনর্মিলনের জন্য। আর সেই পুনর্মিলন আপনাদের ছাড়া অসম্পূর্ণ। মানে, সবকিছুকে হাসিমুখে সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দর্শকদের ছাড়া। তাই অবশ্যই আসবেন।
এইবার থামি। নিজেদের বড়াই আর কত করব! প্লাস, এ বার একটার জায়গায় দুটো জাঁদরেল এডিটর ম্যাডাম জুটেছে। একে তো দেরি করে লেখা জমা দিচ্ছি, তার ওপর বেশি বাজে বকলেই ছবির ওপর মালা চড়বে।
শেষে জানাই কমরেডদের শুভ শারদোৎসব এবং সনাতনীদের শুভ দুর্গাপূজা। সবাই আসুন এবং আমাদের অনেক কষ্টে গড়ে তোলা উৎসবে যোগ দিন (প্লিজ বাজেটের অবস্থা খুবই টাইট এ বার!)
পুনশ্চ:
বাঘদাদা, রাগ কোরো না। লেখাটা AI লিখেছে, আর নামটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। আমার কোনওটাতেই কোনও হাত নেই। ধরলে সুন্দর পিচকারিকে ধরো।মুখপোরাটা এমনিতেই চাকরিটা খেতে চলেছে!

With warm regards,
Debaditya Mukherjee
Vice Chairman
Indian Cultural Connection Essen e.V.

Indian Cultural Connection - Essen e.V.
Presents

ফিরে দেখা

ফিরে দেখা

Together, we build a stronger community. Your support matters!
Please support us here.

Event Sponsors

Media Partners